Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুলেখা খাতুন জুলি

রোলঃ 228020582

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুলেখা খাতুন জুলি

রোলঃ 228020582

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জুলেখা খাতুন জুলি, আইডিঃ 228020582 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Julekha

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

জুলেখা খাতুন জুলি

আইডিঃ 228020582

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

■ ভূমিকা ■ 5
■ কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ■ 5
■ বিজ্ঞান কী ও তার বিকাশধারা ■ 6
■ কোরআনের অলৌকিকতা ও বৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতা ■ 7
■ জ্যোতির্বিজ্ঞান ■ 9
■ পদার্থবিজ্ঞান ■ 18
■ সময় ও আপেক্ষিকতা ■ 21
■ ভূবিজ্ঞান ■ 22
■ সমুদ্রবিদ্যা ■ 24
■ উদ্ভিদবিজ্ঞান ■ 25
■ জীববিজ্ঞান ■ 28
■ প্রাণীবিজ্ঞান ■ 31
■ ভ্রুনতত্ত্ব ■ 37
■ মানবদেহ ■ 43
■ চিকিৎসাবিজ্ঞান ■ 47
■ মন ও স্নায়ুবিজ্ঞান ■ 51
■ উপসংহার ■ 58
সহায়িকা: 59

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

■ ভূমিকা ■

আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্মকে অনেক সময় বিপরীতমুখী মনে করা হয়। এটা সত্যি যে অনেকেই মনে করে বিজ্ঞান ও ধর্ম একে অপরের বিরোধী কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয় বরং এটি একটি আধুনিক বিভ্রান্তি।

প্রকৃতপক্ষে, সত্যিকারের ধর্ম ও সত্যিকারের বিজ্ঞান একই বাস্তবতার দুই দিক মাত্র। ধর্ম সত্য প্রকাশ করে ও উদ্দেশ্য দেয়; বিজ্ঞান সেই বাস্তবতাকে অনুধাবন করার একটি উপায়।

কোরআনুল কারিম এক ব্যতিক্রমী গ্রন্থ, যা প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েও বিজ্ঞানের অনেক সত্যের সঙ্গে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্যতা প্রদর্শন করে। আধুনিক যুগের আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে কোরআনের আয়াত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য কোরআনে পূর্বেই উল্লেখ ছিল। যেমন: ভ্রূণবিকাশ, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, পরমাণুর ধারণা, সাগর ও নদীর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

এই থিসিসের মাধ্যমে মূলত কোরআনে উল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যতা বিশ্লেষণ করা হবে, যা কোরআনের অলৌকিকতা ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য বহন করে।

কোরআন বিজ্ঞানকে উৎসাহ দেয় খুঁজে দেখতে, ভাবতে, যুক্তি করতে।ধর্ম যদি সত্য হয়, আর বিজ্ঞান যদি সত্য অনুসন্ধানের পথ হয় তবে দুটোর মাঝে বিরোধ থাকা সম্ভব নয়।

■ কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ■

পবিত্র কোরআন মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহর বাণী, যা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ২৩ বছর ধরে ধাপে ধাপে নাজিল হয়। এটি আরবি ভাষায় অবতীর্ণ এবং ১১৪টি সূরা ও ৬২৩৬টি আয়াতে বিভক্ত।

কোরআন কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয় বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; যেখানে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি বৈজ্ঞানিক নানা বিষয়কে অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কোরআন আমাদেরকে শুধু ইবাদতের দিকনির্দেশনা দেয়নি; বরং চিন্তা-গবেষণা, শিক্ষাগ্রহণ, প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ এবং জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে এর মধ্যে এমন বহু আয়াত রয়েছে যা প্রকৃতি, মহাবিশ্ব, মানবজীবন ও সৃষ্টিজগতের বৈজ্ঞানিক দিকসমূহ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে।

কোরআনের দৃষ্টিতে জ্ঞান ও গবেষণা:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-আলাক:১)

এই আয়াতটিই কোরআনের জ্ঞানভিত্তিক স্বরূপকে প্রকাশ করে।

কোরআন বারবার মানুষকে চিন্তা, অনুধাবন ও গবেষণার আহ্বান জানিয়েছে। অনেকগুলো আয়াত সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ, যুক্তি ও গবেষণার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা এক অর্থে একটি বৈজ্ঞানিক মনোভাব গঠনের মৌলিক ভিত্তি তৈরি করে।

কোরআনে বারবার বলা হয়েছে_

"তোমরা কি চিন্তা করো না?"(সূরা আন-নাহল:৬৮)

"তোমরা কি দেখ না?"(সূরা আল-গাশিয়া:১৭-২০)

এগুলো নিছক প্রশ্ন নয় বরং এগুলো গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের প্রতি কোরআনের গভীর আহ্বান।

■ বিজ্ঞান কী ও তার বিকাশধারা ■

বিজ্ঞান: বিজ্ঞান হল একটি পদ্ধতিগত জ্ঞানচর্চা, যার মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান, ঘটনা ও নিয়মাবলি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়।

ইংরেজি "Science" শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ *scientia* থেকে যার অর্থ "জ্ঞান"। তবে বিজ্ঞানের বিশেষত্ব হলো_ এটি কেবল জ্ঞান নয় বরং এমন জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণযোগ্য, যাচাইযোগ্য এবং পুনরায় পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়।

বিজ্ঞান সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়:

১.প্রাকৃতিক বিজ্ঞান(পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান)

২.প্রয়োগিক বা প্রযুক্তিগত বিজ্ঞান(প্রকৌশল,চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান)

ইসলামি স্বর্ণযুগে বিজ্ঞানচর্চা:

৭ম থেকে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে এক বিশাল জ্ঞানবিকাশ ঘটে, যাকে "ইসলামি স্বর্ণযুগ" বলা হয়। এ সময় মুসলিম চিন্তাবিদগণ কোরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্ঞানচর্চাকে ইবাদতের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্ব হলেন- ইবনু সীনা,আল-বিরুনি, আল-হায়থাম প্রমূখ।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ:

১৬শ শতাব্দী থেকে ইউরোপে শুরু হয় বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটনের গবেষণা বিজ্ঞানের ধরণ পরিবর্তন করে দেয়।

এরপর ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিজ্ঞানকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। বিজ্ঞানের এই ধারাবাহিক অগ্রগতিতে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। যা আজ প্রযুক্তি, চিকিৎসা, মহাকাশ গবেষণা ও পরিবেশবিজ্ঞানসহ নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে।
তবে বিজ্ঞানের আবিষ্কার সর্বদা পরিবর্তনশীল। একজনের চিন্তা গবেষণাকে আরেকজন বিজ্ঞানী ভুল প্রমান করতে পারেন। তাই আমরা বিজ্ঞানের কেবল প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোকে কোরআনের আলোকে উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।

■ কোরআনের অলৌকিকতা ও বৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতা ■

কোরআন শুধু একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি এক পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইহার অলৌকিকতা মানবজাতিকে বিস্মিত করে চলেছে যুগের পর যুগ। এটি একটি ঐশী কিতাব যা এমন বহু বিষয় তুলে ধরেছে, যা মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগের জ্ঞানের পরিধির বাইরে ছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আজ তা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এই অধ্যায়ে কোরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য এবং তার বৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতা আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

কোরআনের ভাষাগত অলৌকিকতা:

কোরআনের অন্যতম অলৌকিক দিক এর ভাষাশৈলী। নবী মুহাম্মদ (সা.) এর সময় আরবরা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় পারদর্শী ছিল। তাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষের যুগে কোরআনের ভাষা এতটাই বিস্ময়কর ও অনন্য ছিল যে, বহু কবি ও বাগ্মী ব্যক্তিত্ব একে মানবসৃষ্ট নয় বলে স্বীকার করতে বাধ্য হন।
আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন_

قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

তুমি বল, "তাই যদি হয় তাহলে তোমরাও এর মত একটি সূরা বানিয়ে আন, এবং (এ কাজে) আল্লাহ ব্যতীত যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"(সূরা ইউনুস:৩৮)

এই চ্যালেঞ্জ আজও কেউ মোকাবিলা করতে পারেনি, যা কোরআনের অলৌকিকতাকে জোরালোভাবে তুলে ধরে।

তথ্যগত অলৌকিকতা:

কোরআনে এমন বহু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর সত্যতা পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন:
ভ্রূণের বৃদ্ধি ও পর্যায়ক্রমিক বিকাশ, মহাবিশ্বের প্রসারণ,পর্বতের ভূমিকা, আকাশকে রক্ষাকারী ছাদ হিসেবে বর্ণনা। এসব তথ্য মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে মানুষের পক্ষে জানার সুযোগ ছিল না, যা কোরআনের ঐশী উৎসের ইঙ্গিত দেয়।

কোরআনের পূর্বাভাস ও ভবিষ্যদ্বাণী:

কোরআনে এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ আছে, যেগুলো ভবিষ্যতে ঘটবে বলে বলা হয়েছিল, এবং পরবর্তীকালে সেগুলো সত্য হয়েছে। যেমন: রোমানদের বিজয় পূর্বাভাস।

"রোমানরা পরাজিত হয়েছে...কিন্তু তারা অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে।" (সূরা আর-রূম:২–৪)

ইতিহাসে দেখা যায়, বাইজেন্টাইন রোমানরা পারস্যদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যেই জয় লাভ করে, ঠিক কোরআনের বর্ণনার মতো।

কোরআনের বৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতা:

আজকের যুগে বিজ্ঞানের আলোকে অনেকেই কোরআনকে নতুনভাবে অনুধাবন করছে। আধুনিক বিজ্ঞান কোরআনের আয়াতগুলোকে সরাসরি প্রমাণ না করলেও, আয়াতগুলোর ভাষা, দিকনির্দেশনা ও তথ্য উপস্থাপন এমনভাবে হয়েছে, যা আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।যেমন:

পানি ও প্রাণের সম্পর্ক:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

"এবং পানি থেকে আমি প্রতিটি জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি।"(সূরা আম্বিয়া:৩০)

আজকের জীববিজ্ঞান বলে, জীবনের ভিত্তি হলো কোষ এবং প্রতিটি কোষের ৭০-৮০% পানি।

দ্বৈত সৃষ্টির ধারণা:

"আমি সব কিছুকেই যুগলাকারে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা চিন্তা করো।" (সূরা যারিয়াত:৪৯)

এটি পারমাণবিক কণার ইলেকট্রন-প্রোটনের যুগল ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিশ্বাস ও যুক্তির সমন্বয়:

ধর্মকে অনেক সময় শুধুই বিশ্বাসের বিষয় বলা হলেও কোরআন মানুষকে যুক্তির ব্যবহার ও চিন্তার আহ্বান জানিয়েছে। প্রায় প্রতিটি পাতায় প্রশ্ন করা হয়েছে:

"তোমরা কি চিন্তা করবে না?" "তোমরা কি পর্যবেক্ষণ করো না?"

এ থেকে স্পষ্ট হয়, কোরআনের অলৌকিকতা শুধু অন্ধ বিশ্বাস নয় বরং তা যুক্তি,বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে। এতে কোরআন শুধু ধার্মিক নয়, বরং চিন্তাশীল মানুষের জন্য এক চিরন্তন আহ্বান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোরআনের অলৌকিকতা ভাষাগত, তথ্যগত, ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক- এই তিনটি দিকেই প্রতীয়মান।

বিজ্ঞান দিন দিন এগোচ্ছে, আর সেই সঙ্গে কোরআনের আয়াতগুলো নতুন নতুন প্রাসঙ্গিকতায় উঠে আসছে। এই অধ্যায় প্রমাণ করে, কোরআন কেবল প্রাচীন আরবের সমাজ নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানের চূড়ান্ত উৎস হিসেবে আজও বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতার সঙ্গে যুগপৎভাবে প্রাসঙ্গিক।

■ জ্যোতির্বিজ্ঞান ■

জ্যোতির্বিদ্যা হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা আকাশের তারা, চাঁদ, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে গবেষণা করে।
মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই আকাশের দিকে তাকিয়ে এসব বস্তু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে আসছে। আধুনিক যুগে টেলিস্কোপ ও প্রযুক্তির সাহায্যে মহাকাশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে।

কোরআনে অনেক আয়াতে আকাশ, সূর্য, চাঁদ ও রাত-দিনের পরিবর্তন নিয়ে বলা হয়েছে। এই আয়াতগুলো আজকের আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার অনেক তথ্যের সাথে মিলে যায়। এতে বোঝা যায়, কোরআনের বার্তাগুলো অনেক আগেই বিজ্ঞানের সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

ۙ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

"সূর্য নিজ নিজ নির্ধারিত পথে চলে।" (সূরা ইয়াসিন:৩৮)

সূর্য নিজ কক্ষপথে চলে এটি আজ প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্বিজ্ঞান। মহাবিশ্ব প্রসারণশীল এই ধারণা আধুনিক কসমোলজির ভিত্তি।

গ্যাস পিণ্ড: বিজ্ঞানীরা একমত যে, মহাবিশ্বে ছায়াপথ তৈরির আগে আকাশ সম্পর্কিত পদার্থগুলো গ্যাস জাতীয় জিনিস ছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিপুল সংখ্যক গ্যাসজাতীয় পদার্থ কিংবা মেঘ, ছায়াপথ তৈরির আগে বিদ্যমান ছিল। আকাশ সম্পর্কিত প্রাথমিক পদার্থকে গ্যাস অপেক্ষা ধোঁয়া বলা বেশী সঙ্গত। কোরআন মজীদ ধোঁয়া দ্বারা মহাবিশ্ব সৃষ্টির ঐ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে_

ثُمَّ اسْتَوَى إِلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائتِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهَا ، قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

"তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।"(সূরা হা-মীম সাজদাহ-১১)

প্রথম যুগে মানুষ বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী চেপ্টা ছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপী মানুষ দূরে সফরে যেতে ভয় পেত কি জানি পৃথিবীর কিনারা থেকে পড়ে যায় কিনা। স্যার ফ্রান্কিস ট্র্যাক প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

"আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান?" (সূরা লোকমান-২৯)

অর্থাৎ রাত আস্তে আস্তে এবং ক্রমান্বয়ে দিনে রূপান্তরিত হয়, অনুরূপভাবে দিনও আস্তে আস্তে এবং ক্রমান্বয়ে রাতে পরিবর্তিত হয়। পৃথিবী গোলাকৃতির হলেই কেবল এ ঘটনা ঘটতে পারে।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ

"*তিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন যথার্থভাবে। তিনি রাতকে দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" (সূরা যোমার-৫)*

আয়াতে ব্যবহৃত يُكَوِّرُ 'শব্দের অর্থ হল কুন্ডলী পাকানো' বা কোন জিনিসকে প্যাঁচানো। যেমন করে মাথায় পাগড়ী প্যাঁচানো হয়। রাত ও দিনের আবর্তন তখনই সম্ভব যখন পৃথিবী গোলাকার হয়।
পৃথিবী বলের মত গোলাকার নয়, বরং মেরুকেন্দ্রিক চেপ্টা।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

"*তিনি পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।"(সূরা নাযিআত-৩০)*

আরবী শব্দ دَحَاهَا এর দু'টো অর্থ আছে। একটি অর্থ হল 'উটপাখীর ডিম।' উটপাখীর ডিমের আকৃতির মতই পৃথিবীর আকৃতি মেরুকেন্দ্রিক চেপ্টা। অন্য অর্থ হল 'সম্প্রসারিত করা।' উভয় অর্থই বিশুদ্ধ।

মহাকাশ: বিজ্ঞানীরা বলেছে সূর্য যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এর থেকে যদি কয়েক ডিগ্রী ওপরে উঠে যায় তাহলে গোটা পৃথিবী বরফে পরিণত হয়ে যাবে। সমস্ত প্রাণীজগৎ বরফ হয়ে যাবে। আর যদি কয়েক ডিগ্রী নিচে নেমে আসে তাহলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

চাঁদ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে যদি কিছু অংশ ওপরে উঠে যায় তাহলে গোটা পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যাবে। আবার যদি কিছু অংশ নিচে নেমে আসে তাহলে গোটা পৃথিবী পানিতে তলিয়ে যাবে।

সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি যেন পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে না পারে, সে জন্য ওজোন স্তরে লেয়ার দিয়েছেন। এই লেয়ার আছে বলেই আলট্রাভায়োলেট-রে পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টি জগতকে রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন।

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا

“কে এ যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন? কে এর মাঝে নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন? কে তাতে সুদৃঢ় পর্বত ও দু'সাগরের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন?” (সূরা নামল:৬)

মাধ্যাকর্ষণ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী হতো, তাহলে বাতাস এতটা ঘন হয়ে যেতো যে, কোন প্রাণী নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারতো না, মৃত্যু ছিল অনিবার্য। বাতাসের চাপ বৃদ্ধি লাভ করতো এবং জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হতো না, ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হতো না, শীতলতা বৃদ্ধি লাভ করতো, ভূ-পৃষ্ঠের কোন এলাকাই বাসযোগ্য হতো না বরং ভারীত্বের আকর্ষণ অনেক বেশী হলে মানুষ ও পশুর শারীরিক দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কম হতো কিন্তু তাদের ওজন এতটা বৃদ্ধি লাভ করতো যে, তাদের পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব হতো না।

ব্লাকহোল বা অন্ধকূপ: ব্লাকহোল বা অন্ধকূপ এক অদৃশ্য দানবীয় শক্তি। নক্ষত্র যতো বড়ই হোক না কেন, পরিভ্রমণ করতে করতে এই ব্লাকহোলের রেঞ্জের মধ্যে এসে গেলে, এমনভাবে শোষণ করে নেয় তার আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানীগণ বলেন, আমাদের এই পৃথিবী কোনভাবে যদি ব্লাকহোলের আওতায় এসে পড়ে, তাহলে মুহূর্তের ভেতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

এই ব্লাকহোল সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

“শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তোমরা যদি জানতে তা এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ।” (সূরা ওয়াকিয়া-৭৫-৭৬)

ছায়াপথ: আমাদের ছায়াপথ এবং সূর্যেরও একটি গতিপথ আছে এবং তাদের নিজ নিজ মেরুদণ্ডের ওপরে ঘুরপাক খেতে খেতে তাদের কেন্দ্রকে আবর্তন করে আসতে মোট সময় লাগবে পঁচিশ কোটি বছর।

। أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্য কখনও ধরতে পারবে না চন্দ্রকে, কিংবা রাত্রি অতিক্রম করতে পারবে না দিবসকে, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে নিজ নিজ কক্ষপথে। [সূরা ইয়াছিন:৪০]

আকাশ একটি ছাদ: মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে মানুষকে যেখানে প্রেরণ করবেন, সে পৃথিবীকে নানাভাবে সজ্জিত করেছেন। পৃথিবীর ছাদ হিসাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। যমীনকে গালিচার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন। তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا لسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ رَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مَنَ الثَّمَرَاتِ

“সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে গালিচা হিসাবে বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশকে ছাদ হিসাবে নির্মাণ করেছেন, তারপর সে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তার সাহায্যে নানা ধরনের ফল উৎপন্ন করে তোমাদের জন্য রিক্কের ব্যবস্থা করেছেন।”(সূরা বাকারা-২২)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

“তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত ও সমুদ্ভাসিত করে দিয়েছি।” (সূরা মুল্ক-৫)

কোন পিলার নেই, কোন স্তম্ভ নেই-মানুষের দৃষ্টিতে কোনকিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ আকাশ ঠিকই যথাস্থানে অবস্থান করছে।

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّظِرِينَ

"আকাশে আমি অনেক শক্তিশালী দূর্গ নির্মাণ করেছি, দর্শকদের জন্য সেগুলো, সুসজ্জিত করেছি।" (সূরা হিজর-১৬)

তবে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উর্ধ্বজগৎ থেকে যে ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, তা যেসব স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছেঁকে প্রয়োজনীয় রশ্মি পৃথিবীতে প্রেরণ করে, সেসব স্তরই বুরুজ হতে পারে। আবার উর্ধ্বজগতে শয়তানের প্রবেশ পথে যেসব বাধা নির্মাণ করা হয়েছে, তাও বুরুজ হতে পারে।

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

"এরা কি কখনো নিজেদের ওপরে অবস্থিত আকাশমন্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে না? কিভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত করেছি আর তাতে কোথাও কোন ধরনের ফাঁক ও ফাটল নেই।"(সূরা ক্বাফ-৬)

চাঁদের আলো: আগের সভ্যতাগুলোর ধারণা ছিল, চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। কিন্তু বিজ্ঞান বর্তমানে আমাদেরকে বলে যে, চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো।

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

"কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলকে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র।" -সূরা ফুরকান-৬১

কোরআনে سِرَاجٌ শব্দ দ্বারা সূর্য বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হল, বাতি বা মশাল। অন্য জায়গায়, সূর্যকে سِرَاجًا وَهَاجًا উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল 'জ্বলন্ত কিরণোজ্জল বাতি বা মশাল।' অন্য আরেক জায়গায়, একই অর্থ বুঝানোর জন্য ضياء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হল 'কিরণোজ্জ্বল সূর্য'। এই তিনটি বর্ণনাই সূর্যের উপযোগী। কেননা, সূর্য নিজ দহনক্রিয়ায় ব্যাপক তাপ ও আলো উৎপাদন করে।
চাঁদের আরবী প্রতিশব্দ হল قمر। কোরআন চাঁদকে منير বলেছে। এর অর্থ হল 'স্নিগ্ধ আলোদানকারী।' অর্থাৎ প্রতিফলিত আলো দেয়। কোরআনের বর্ণনা চাঁদের আসল প্রকৃতির সাথে খাপ খায়। চাঁদ নিজ থেকে আলো দেয় না। বরং তা এমন এক নিষ্ক্রীয় জিনিস যার উপর সূর্যের আলোর প্রতিবিম্ব ঘটে। কোরআনে কখনও চাঁদকে سراج ، وهاج কিংবা ضيا বলা হয়নি এবং সূর্যকেও نور কিংবা منير বলা হয়নি।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا

"*তিনিই সে সত্তা যিনি সূর্যকে কিরণোজ্জল এবং চাঁদকে স্নিগ্ধ আলোয় আলোকিত করেছেন।"(সূরা ইউনুস: ৫)*

বিগত ৫ বিলিয়ন বছর ব্যাপী রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সূর্যের দেহে তাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ভবিষ্যতে এক সময়ে এর অবসান ঘটবে এবং তখন সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। ফলে পৃথিবীর সকল প্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ، ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

এখানে উল্লেখিত مستقر শব্দটির অর্থ হল 'নিদ্দিষ্ট স্থান' বা 'সময়'। কোরআন বলছে, সূর্য একটা নির্ধারিত স্থানের দিকে আবর্তিত হচ্ছে যা একটা নিদ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এর অন্য অর্থ হল, একদিন তার অবসান ঘটবে। এমর্মে আল্লাহ বলেন_

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

"যখন সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।" (সূরা তাকবীর-১)

সূর্যের নিষ্প্রভ হওয়া কেয়ামতের লক্ষণ।

সূর্য ঘুরছে: মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে প্রথমে ধারণা করে ছিল "সূর্য ঘুরছে, পৃথিবী স্থির। আবার পরবর্তীতে ধারণা করেছে যে সূর্য স্থির, পৃথিবী তার চতুর্দিকে ঘুরছে আর তাই দিন ও রাতের সৃষ্টি হচ্ছে।

আসলে উক্ত দু'টি মতবাদের কোনটাই সঠিক ছিল না বরং সূর্য ও পৃথিবী সহ মহাশুন্যে যা কিছু আছে সবই মহান শ্রষ্টার বেঁধে দেয়া নিয়মে সুনির্দিষ্ট পথে চলছে। সূর্যের ব্যাপারে কুরআন বলেছে_

والشَّمْسُ تَجْرِي لمستقر لَهَا ذلك تَقْدِيرُ العزيز العليم

সূর্য তার নির্ধারিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে গমন করছে। এটা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর সুনির্ধারিত ব্যবস্থা। (সূরা ইয়াছীন ৩৮)

সূর্য ও চন্দ্রের নির্ধারিত হিসাব: দিন যায় রাত আসে, মাস যায় বছর আসে, সৃষ্টির শুরু থেকে এ বিধান চালু রয়েছে। আল্লাহ তাআলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের

গতি-বিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতি বিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না।

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسبان

"*সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে।" (সূরা রাহমান ৫)*

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব: এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুর থেকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে বর্তমানেও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অনন্ত কাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। যখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখনই ঘটবে মহাপ্রলয়। মহাবিশ্বে যদি সম্প্রসারণ গতি না থাকতো, তাহলে মহাবিশ্বের কোন বস্তুরই বিকাশ ঘটতো না এবং যে গতিতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে গতি সামান্য কম বা বেশী হলে মহাবিপর্যয় ঘটতো, মহাবিশ্বের কোন অস্তিত্বই থাকতো না।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"আমি আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলেই এই আকাশ সৃষ্টি করেছি, অবশ্যই আমি মহান ক্ষমতাশালী।"(সূরা যারিয়াত-৪৭)

এই আয়াতে ব্যবহৃত **'মুছিউন'** শব্দের অর্থ, বিশালতা ও বিস্তৃতি দানকারী, কোন কিছুর সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি ঘটানো ইত্যাদি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। এটি কোরআনের দাবির সঙ্গে অসাধারণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি: বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তর হচ্ছে অত্যধিক ভারী এবং যার ওজন যত ভারী হবে তার আকর্ষণ তত শক্তি শালী হবে। তারা বলছেন আমরা যত মাটির নিচে নেমেছি ওজন তত বেড়েছে, তারা জমিনের অভ্যন্তরে ঠিক মাঝামাঝিতে এক প্রকার ভারী তরল পদার্থ পেয়েছেন যা সেখানে ঘুরছে। তার এই চলাচলটা একটা পথে পরিণত হয়েছে। আর এই হচ্ছে ম্যাগ্নেটিস যা প্রত্যেক বস্তুকে টেনে নেয় বা আকর্ষণ করে। তারা আরও বর্ণনা করেছে যে এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থাকার কারণেই মানুষ পৃথিবীর উপর চলাফেরা করতে পারছে, বৃষ্টির পানি নিচে মাটিতে আসে, গাছের ফল জমিনে পড়ে, বাতাস পৃথিবীর সাথে লেগে থাকে। শুধু তাই নয় পৃথিবী হতে কোন

বস্তুর দূরত্ব যতই বাড়তে থাকে ততই তার ওজন কমতে থাকে। আর যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যবস্থা মহান স্রষ্টা না করতেন তবে পৃথিবীর সব কিছু মহাশূন্যে হারিয়ে যেত, তা আর পাওয়া যেত না।

إذا زلزت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها

"যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে। যখন সে তার বোঝা বের করে দিবে। "(সূরা যিলযাল ১-২)

পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভারী বোঝা রয়েছে। আর এই বোঝাগুলো অনতিবিলম্বে বেরিয়ে আসবে। যখন সেগুলো বের হয়ে আসবে তখন অবস্থা কি হবে?

وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت

"যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবীর গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও তা শূন্যগর্ভহয়ে যাবে। "(সূরা ইনসিকাক ৩-৪)

পৃথিবীর গর্ভস্থিত সবকিছু যখন বের হয়ে যাবে তখন আর তার মাধ্যাকর্ষণ থাকবে না। এই মহা বিশ্বের সুন্দর আইন শৃঙ্খলা ও নিয়ম নীতি আর থাকবে না। এ সব কিছুই হবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টান না থাকলে অথবা কম হলে জলীয় বাষ্প উপরের দিকে চলেই যেত। আবার উপরে ঠান্ডা বাতাস জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করতে না পারলে জলকণা তৈরি হত না। ফলে বৃষ্টিও হত না। তাহলে একদিন পৃথিবীর সব পানিই বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াত। আর ফিরে আসত না। ফলে পৃথিবীতে কোন পানিই খুঁজে পাওয়া যেত না। যার ফলে নিঃশেষ হয়ে যেত জীবনের অস্তিত্ব।

পৃথিবী যদি চাঁদের মত ছোট অর্থাৎ বর্তমান আয়তনের চারভাগের একভাগ হত তবে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হত বর্তমানে যা আছে তার ৬ ভাগের ১ ভাগ। তাহলে সূর্যের তাপে পানি বাষ্প হয়ে উপরের দিকে চলে গেলে আর ফিরে আসত না কোনদিন। মাধ্যাকর্ষণ কম হওয়ার কারণে চলে যেত তো চলেই যেত। ফলে দ্রুত শেষ হয়ে যেত পৃথিবীর সমুদয় পানি।

চাঁদ সবসময় পৃথিবীর দিকে একদিক মুখ করে ঘুরে। চাঁদের মত পৃথিবীও যদি সূর্যের দিকে একদিকে হত তাহলে সেই দিক হতো তীব্র শীত, যার কারণে পানি বরফ হয়ে যেত আর

অন্যদিকে প্রখর গরমের জন্য পানি বাষ্পীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকত। অতি গরম ও অতি শীত কোন অবস্থায়ই পানি পাওয়া সম্ভব হত না।

পৃথিবী যদি সূর্যের সমান বড় হত তবে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হত বর্তমানের ১৫০ গুণ। যার কারণে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা ৪ মাইলের চেয়েও কমে যেত। তাহলে পানি আর বাষ্পীভবন হত না। সারা পৃথিবী ডুবে যেত পানিতে।

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যদি বর্তমানের দ্বিগুণ হত তাহলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপ কমে গিয়ে দাঁড়াত বর্তমানের ৪ ভাগের ১ ভাগে। তদুপরি কক্ষপথ বৃদ্ধির কারণেও শীতকালের পরিমাণ হত বর্তমানের চার গুণ। কাজেই সারা পৃথিবীর পানি বরফে পরিণত হয়ে যেত। এমনকি গ্রীষ্মকালেও মুক্ত পানি পাওয়া যেত না। তীব্র শীত ও মুক্ত পানির অভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত অতি সহজেই।

আকাশের পরিধি:

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ

"তিনি আকাশ উঁচু করেছেন ও তুলাদণ্ড (পরিমাপযন্ত্র) স্থাপন করেছেন।" (সূরা রহমান:৭)

মানুষ যখন স্বাভাবিক দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকায় তখন আসমানকে অতি নিকটে ধারণা করে। আসলে প্রকৃত অবস্থা তা নয়।
رفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاها

"*তিনি আকাশকে উঁচু করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।" (সূরা নাযিআত-২৮)*

আজকের বিজ্ঞান আমাদেরকে মূল্যবান তথ্যাদি সরবরাহ করছে যে, আমরা যে মহাবিশ্বের অধীন, সেই মহাবিশ্বটি প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোক বর্ষ বিস্তৃত হয়ে মহাশূন্যে অবস্থান করছে। এই মহাবিশ্বের বড় বড় বস্তুসম্ভার হচ্ছে গ্যালাক্সিসমূহ। যে গ্যালাক্সি গড়ে প্রায় প্রতিটি ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র ধারণ করে

ঊর্ধ্বগমন:

"আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপদগামী করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন যেন সে আকাশে আরোহণ করেছে।" (সূরা আনআম ৬ঃ ১২৫)

সেই যুগের মানুষ আকাশে আরোহণের উপমাকে কাল্পনিক ধারণা করেছিল। কাল্পনিক ধারণা করাই স্বাভাবিক কারণ সেই যুগে রকেট, বিমান, হেলিকপ্টার কিছুই আবিস্কার হয়নি অথচ আয়াতটি এই ইঙ্গিত বহন করে যে, মানুষ তাদের জীবনে আকাশে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। আর এই উপমা কাল্পনিক নয় বরং বাস্তবিক বর্তমানে মানুষ উর্ধে গমনের মাধ্যমে জানতে সক্ষম হচ্ছেই যে, যত উপরে উঠা যায় তাতে অক্সিজেন ততই কমতে থাকে। বাতাসে অক্সিজেন কম থাকলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, হৃদয় সংকীর্ণ হতে থাকে।

■ পদার্থবিজ্ঞান ■

বিগ ব্যাং: আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞান অনুসারে, মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে প্রায় ১৫০০কোটি বছর আগে একটি অত্যন্ত ঘন ও গরম বিন্দু থেকে। এই বিস্ফোরণকে বলা হয় "বিগ ব্যাং"। এই সময় মহাবিশ্বের স্থান, সময়, পদার্থ ও শক্তির সূচনা হয় এবং এরপর থেকে মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

Big Bang ইংরেজি শব্দ, যার অর্থ হলো বিকট শব্দ। এই বিগ বেঙ থিওরির মূল কথা হলো, আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে সৌরজগতে এক দিন হঠাৎ নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষ হয় এতে একটি বিকট শব্দ হয়। এই বিকট শব্দের মাধ্যমে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গ্রহ নক্ষত্রের টুকরো থেকেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি।

আধুনিক যুগে পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে বিগ ব্যাং থিওরি সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য এবং সবচেয়ে বেশী বৈজ্ঞানিক। যদিও এই থিওরি নিয়েও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

বিগ ব্যাং থিওরি মতে আজ থেকে ১০-১২ বিলিয়ন বছর আগে সৌরজগতে একটি বিকট শব্দে এক মহা সংঘর্ষ হয়েছিল। সে সংঘর্ষে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং সে টুকরো থেকেই আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি।এ প্রসঙ্গে কুরআনের বক্তব্য হলো__

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۤءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ؟ ۗ

"কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?" [সূরা আম্বিয়া: ৩০]

এই আয়াতে "একত্রিত" এবং "পৃথক করা" শব্দবন্ধটি এমন একটি অবস্থা নির্দেশ করে যা বিগ ব্যাং-এর ধারণার সঙ্গে অসাধারণভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে কোরআনে মহাবিশ্বের সূচনার একটি মৌলিক ধারণা হাজার বছর আগে তুলে ধরা হয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞান আজকে পরীক্ষার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছে।

Big Bang বিন্দু হতে পর্যায়ক্রমে ৪টি ধাপ অতিক্রম করার পর 'শক্তি' পদার্থ কণার ধোঁয়ায় অস্তিত্ব লাভ করে এবং মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গুচ্ছ গুচ্ছভাবে বিভক্ত হয়ে মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে_

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اعْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِمِينَ

“অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো-ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা এলাম অনুগত হয়ে।”(হা-মীম সাজদা-১১)

Big Bang তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে, এবং সূচনালগ্নে সেটি ছিল ধোঁয়াচ্ছন্ন। এটি কোরআনের “ধোঁয়াময়” অবস্থা বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারন: এডউইন হাবল আবিষ্কার করেন যে, সব গ্যালাক্সি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর মানে হলো, মহাবিশ্ব একসময় ছোট ছিল এবং এখন তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। Adh-Dhariyat ৫১:৪৭

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

“*আসমানকে আমি হাত দ্বারা তৈরী করেছি। নিশ্চয়ই আমি (এর বিশালতাকে) বিস্তৃত করতে সক্ষম।”(সূরা যারিয়াত:৪৭)*

আয়াতে ব্যবহৃত "মুসি'ঊন" (نحن لموسعون) শব্দটি আরবি ভাষায় সম্প্রসারণ বা প্রসার ঘটানো বোঝায়। এটি এমন এক বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ইঙ্গিত করছে যা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় মানুষের জ্ঞানের বাইরে ছিল। কোরআনের এই আয়াত আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে মিলে যায় এবং কোরআনের ঐশী উৎসের সম্ভাব্য ইঙ্গিত দেয়।

অদৃশ্য পদার্থ ও শক্তি: গবেষণা অনুযায়ী, মহাবিশ্বের মাত্র ৫% দৃশ্যমান পদার্থ দিয়ে গঠিত। বাকি প্রায় ৯৫% অংশ গঠিত অদৃশ্য পদার্থ (Dark Matter) ও শক্তি (Dark Energy) দিয়ে, যেগুলো আমাদের চোখে দেখা যায় না, তবে মহাকর্ষ বা অন্যান্য প্রভাবের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত এবং তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত। [২] *তিনি সবকিছু পরিপূর্ণভাবে জানেন।" (আল হাদিদ:৩)*

যদিও এই আয়াতে সরাসরি ডার্ক ম্যাটার বা শক্তির কথা বলা হয়নি, তবুও "অপ্রকাশ্য" বা "অদৃশ্য" বিষয় সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য মানব উপলব্ধির সীমা ছাড়িয়ে থাকা জগৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত বহন করে। এটি আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

পদার্থ ও শক্তির রূপান্তর: আলবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত বলছে, পদার্থ এবং শক্তি একে অপরের মধ্যে রূপান্তরযোগ্য। এই সূত্র আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে একটি মৌলিক নীতিতে পরিণত হয়েছে।

اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓي اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۛ بَلٰي وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ
اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

"যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ (অন্য কিছু) সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই; তিনিই তো সর্বজ্ঞ মহাস্রষ্টা। তিনি যখন কোন কিছু করতে চান তখন তাকে শুধু "হও" বলে নির্দেশ দেন, আর অমনি তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসিন:৮১-৮২)

এই আয়াত সৃষ্টির গতি ও সহজতার ধারণা তুলে ধরে, যা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের "শক্তির মাধ্যমে পদার্থ সৃষ্টি" বা "পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তর"-এর ধারণার সঙ্গে মিল খায়। আল্লাহর 'কুন ফায়াকুন' (হও, হয়ে যায়) নির্দেশ এক প্রকার শক্তির তাৎক্ষণিক প্রয়োগের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ ও গতি:

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মতে, প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র মহাকর্ষবল বা গ্র্যাভিটির কারণে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে। এই নিয়ম ছাড়া মহাবিশ্বে শৃঙ্খলা থাকতো না।

"সূর্য নিজ নির্দিষ্ট পথে চলছে। এটি পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ। চন্দ্রের জন্য নির্ধারিত পর্যায় রয়েছে... সূর্য কখনো চাঁদকে স্পর্শ করে না এবং রাত্রিও দিনের অগ্রবর্তী নয়। প্রত্যেকটি নিজ নিজ কক্ষপথে চলছে।"(সূরা ইয়াসিন:৩৮-৪০)

এই আয়াতগুলো পদার্থবিজ্ঞানের কক্ষপথ ও গ্র্যাভিটেশনাল নিয়মাবলির স্পষ্ট প্রতিফলন। হাজার বছর আগে কোরআনে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যার উপস্থিতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর।

■ সময় ও আপেক্ষিকতা ■

সময় ধ্রুব নয়, বরং বস্তুর গতি ও মহাকর্ষ বল সময়ের প্রবাহকে প্রভাবিত করে।
যেকোনো বস্তুর গতি যদি আলোর গতি (৩ লাখ কিমি/সেকেন্ড) এর কাছাকাছি হয়, তবে সময় তার জন্য ধীরে চলে। এই ধারণাকে বলে Time Dilation।
উদাহরণ:
যদি একজন মহাকাশচারী আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে চলতে থাকা রকেটে এক বছর থাকেন, তবে পৃথিবীতে হয়তো ১০০ বছর কেটে যাবে। অর্থাৎ, সময় আপেক্ষিক।
কোরআন একাধিক আয়াতে ভিন্ন সময়মাত্রা উল্লেখ করেছে (একদিন = ১০০০ বছর বা ৫০,০০০ বছর)।

"তারা তোমার কাছে কিয়ামতের সময় জিজ্ঞেস করে। বলো: এর জ্ঞান আমার প্রভুর কাছেই।... মনে করো, যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, আর তোমরা মনে করবে, 'আমরা তো অল্প সময়ই ছিলাম'।" [সূরা ইসরা ১৭:৮৫]

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

"আল্লাহর কাছে একদিন তোমাদের হিসেব অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান।"
[সূরা হাজ্জ ২২:৪৭]

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ

"ফেরেশতা ও জিবরাইল তাঁর দিকে আরোহন করে, এমন এক দিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।"
[সূরা মা'আরিজ ৭০:৪]

এই আয়াতগুলো বোঝায় যে সময় সৃষ্টিজগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে প্রবাহিত হয়—যা আপেক্ষিকতার মূল ধারণার সঙ্গে মিলে যায়।
এগুলো আপেক্ষিক সময়ের ধারণা এবং মহাবিশ্বের স্তরভেদ অনুযায়ী সময় পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত। মানুষের সময় ও আল্লাহর সময়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে।

■ ভূবিজ্ঞান ■

ভূবিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা পৃথিবীর গঠন, গঠন প্রক্রিয়া, উপাদান, ভূ-তাপীয় শক্তি, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, নদী-প্রবাহ, আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে। কোরআনেও পৃথিবীর সৃষ্টির, তার গঠন ও বিভিন্ন ভূ-প্রকৃতির ওপর নানা উল্লেখ রয়েছে, যা আধুনিক ভূবিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পৃথিবীর সৃষ্টি ও গঠন: আধুনিক ভূবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে:
পৃথিবীর গঠন হলো বহু স্তরের সমষ্টি—ভূত্বক, ম্যান্টল, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কোর। পৃথিবী প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে তৈরি হয়ে সময়ের সাথে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা ও কঠিন হয়। এর ভূত্বক বা শিলাপৃষ্ঠ স্থিতিশীল হওয়ায় মানুষ এবং জীবজগতের আবাসস্থল হিসেবে উপযোগী হয়েছে। ভৌত বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবী একটি বলয়াকার গঠন, যার অভ্যন্তরে তাপ ও চাপের কারণে আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটে।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا

“*যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে একটি বিছানা বানিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য পথ তৈরী করে দিয়েছেন” (ত্বহা:৫৩)*

এখানে “বিছানা” শব্দটি পৃথিবীর স্থিতিশীল ও বসবাস উপযোগী অবস্থার সূচক। কোরআন ইঙ্গিত দেয় যে, পৃথিবী মানুষের চলাফেরার উপযোগী একটি স্তর হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আধুনিক ভূবিজ্ঞানের "ভূত্বক" এবং তার স্থিতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ভূমির স্তর ও পাহাড়ের ভূমিকা: পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে—মাটি, পাথর, খনিজ। পাহাড় মূলত টেকটোনিক প্লেটের চাপ ও সংঘর্ষের মাধ্যমে তৈরি হয়। ভূবিজ্ঞানের গবেষণায় জানা

গেছে পাহাড় শুধুমাত্র দৃশ্যমান গঠন নয়, বরং এগুলো ভূমিকম্প কমাতে একটি প্রাকৃতিক বাফার হিসেবে কাজ করে।

وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ

“তিনি জমিনে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে” (নাহল:১৫)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, পাহাড় পৃথিবীর ভূমিকম্পকে নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাস করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক ভূবিজ্ঞানের "পাহাড় ভূমিকম্প নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে" তত্ত্বের সঙ্গে কোরআনের এই বর্ণনা যুগপৎ।

ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি: ভূমিকম্প ঘটে যখন পৃথিবীর টেকটোনিক প্লেটগুলি একে অপরের নিচে ঢুকে পড়ে বা সরে যায়। এই প্রক্রিয়ায় শক্তি মুক্ত হয় যা ভূ-কম্পন সৃষ্টি করে। আগ্নেয়গিরি হলো পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গরম লাভা ও গ্যাস বের হওয়া, যা ভূমির ভিতরে থাকা তাপ ও চাপের কারণে ঘটে।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

“পৃথিবী যখন তার প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে।”(যিলযাল:১)

এখানে ভূমিকম্পের শারীরিক বর্ণনা স্পষ্ট। কোরআন ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করেছে যা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।
পৃথিবীর ভূত্বকটি অনেকগুলো বিশাল ও ছোট ছোট প্লেটে বিভক্ত, যেগুলো ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হয়। এই প্লেটগুলো একে অপরের সাথে সংঘর্ষ, বিভাজন বা সন্নিকটে চলে যাওয়ার ফলে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ফাটল, পর্বত সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, হিমালয়ের পাহাড় গঠন হয়েছে ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষের কারণে।

■ সমুদ্রবিদ্যা ■

সমুদ্র বা মহাসাগর পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রায় ৭০% অংশ জুড়ে বিস্তৃত, যা জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্য অপরিহার্য। আধুনিক সমুদ্রবিদ্যা পানির গতিবিধি, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, এবং সমুদ্রের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করে।
কোরআনেও সমুদ্রের গভীরতা, তাদের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য, এবং সমুদ্রের ব্যবস্থাপনাকে উল্লেখ করে, যা আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞানের তথ্যের সাথে মিলে।

সমুদ্রের সৃষ্টি ও বিস্তার: পৃথিবীর সৃষ্টি পর্যায়ে বাষ্পীয় অবস্থা থেকে জলীয় গ্যাস কনডেন্স হয়ে মহাসাগর গঠিত হয়। সমুদ্র পানির ঘনত্ব, তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা বিভিন্ন জায়গায় পরিবর্তিত হয়। এছাড়া সমুদ্রের গভীরতাও বিভিন্ন হয়, যেখানে গর্ত, শিলাপাথর ও পর্বত মূর্তির মত বৈচিত্র্য দেখা যায়।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا

"তিনিই দুই সমুদ্র (দুই প্রকার পানি) সমান্তরালে প্রবাহিত করেছেন। একটি মিষ্ট ও সুপেয় এবং আরেকটি লোনা ও তিক্ত। এবং উভয়ের মাঝখানে এক অন্তরায় ও সুদৃঢ় বাধা স্থাপন করে দিয়েছেন।"(সূরা ফুরকান:৫৩)

এই আয়াত সমুদ্রের মিঠা ও লবণাক্ত পানির পৃথকতা এবং তাদের মধ্যে অমিশ্রণীয় সীমানার ইঙ্গিত দেয়, যা আজকের সমুদ্রবিদ্যার "ফ্রেশ ওয়াটার ও সল্ট ওয়াটার মিক্সিং" বা হ্যালোক্লাইন জোনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সমুদ্রের প্রবাহ ও তরঙ্গ: সমুদ্রের গভীর ও গভীরতর অঞ্চলে পানি প্রবাহ এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপের কারণে বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ ও স্রোত তৈরি হয়। যেমন, প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া যায় "এল নিনো" ও "লা নিনা" ঘটনা যা বিশ্বব্যাপী জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। সমুদ্রের তরঙ্গ এবং স্রোতসমূহ বৈশ্বিক জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ

"তিনি (লোনা ও মিঠা পানির) দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত অবস্থায় প্রবাহিত করেছেন। তাদের মাঝখানে একটি অন্তরাল আছে, যা তারা অতিক্রম করে না।" (আর রহমান:১৯-২০)

কোরআনের এই বর্ণনা সমুদ্রের বিভিন্ন স্রোত ও তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে, যেখানে মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির পৃথক স্রোত রয়েছে।

সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য: সমুদ্র জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। বিভিন্ন মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও মাইক্রোঅর্গানিজমের বাসস্থান এটি। সমুদ্র সম্পদ যেমন মাছধরা, খনিজ ও তেল আহরণ আধুনিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

"অথবা (তাদের কর্ম) অতল সমুদ্রের মাঝে গাঢ় অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে আছে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, তার ওপর মেঘ। অন্ধকারের ওপর অন্ধকার। সে নিজের হাত বের করলেও (ঐ অন্ধকারে) তা দেখতে পাবে না। আল্লাহ যার জন্য কোন আলো তৈরী করেননি সে কোন আলোর সন্ধান পাবে না।" (আন নুর:৪০)

এখানে সমুদ্রের গভীরতা, অন্ধকার ও জীববৈচিত্র্যের পরিমাপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা সমুদ্রের রহস্য ও জীববৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে খাপ খায়।
কোরআনের আয়াতে সমুদ্রের বৈচিত্র্য, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞানের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য বহন করে। কোরআন সমুদ্রের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় যেমন পানির লবণাক্ততা, তরঙ্গের গতি, এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে হাজার বছর আগে থেকেই নির্দেশ দিয়েছে।

■ উদ্ভিদবিজ্ঞান ■

পানি থেকে সৃষ্টি:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ

" এবং পানি থেকে আমি প্রতিটি জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি।"(আল আম্বিয়া:৩০)

বিজ্ঞান বলছে, সকল জীবিত কোষের মূল উপাদান হলো পানি। উদ্ভিদের কোষের ৭০-৯০% পানি, যা তাদের জীবনচক্র ও পুষ্টি গ্রহণে অপরিহার্য। পানি ছাড়া উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না।

উদ্ভিদের জোড়াবদ্ধ: উদ্ভিদ বিজ্ঞানের মতে, প্রত্যেক উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ আছে। এমনকি সমজাতীয় লিঙ্গ বিশিষ্ট উদ্ভিদেরও পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ আছে।

পূর্বে মানুষ জানত না যে, উদ্ভিদের মাঝেও পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ রয়েছে।

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

"আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহন কর।" -সূরা আয-যারিয়াতঃ ৪৯

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি সম্পর্কিত এ আয়াত মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও ফলসহ সবকিছুকে বুঝায়। এমনকি এটা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন ও ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটনের সমন্বয়ে গঠিত বিদ্যুতের পরমাণুকেও বুঝায়।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

"*আর সকল প্রকারের ফল হতে। সেখানে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।" -সূরা রা'দঃ ৩*

ফল উৎপাদনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে ফুল পাওয়া যায়; এই ফুলে পুরুষ অঙ্গ "পুংকেশর" ও স্ত্রী অঙ্গ "গর্ভকেশর" রয়েছে। কোন ফুলের স্ত্রী অঙ্গে যখন পরাগের মাধ্যমে পুংকেশর প্রবিষ্ট হয়, তখন সে ফুল গর্ভবতী হয়, পরে এই ফল পরিপক্ক হয় এবং তার বীজ ছড়ায়। সকল ফলের মধ্যেই যে পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ রয়েছে তা কুরআনে উল্লিখিত এক মহাসত্য।

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

"মহিমা সেই পবিত্র সত্তার, যিনি জমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদের ও তাদের নিজেদের (অর্থাৎ মানুষের) এবং তারা যাদের কথা জানে না তাদের সব জোড়া সৃষ্টি করেছেন।"
(সূরা ইয়াসিন:৩৬)

আজকের উদ্ভিদবিজ্ঞান বলছে—গাছের পুরুষ ও স্ত্রী উপাদান রয়েছে, এবং সেগুলোর মিলনেই ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়। কোরআনের এই বক্তব্য আধুনিক জেনেটিক রিপ্রোডাকশন তত্ত্বের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়।
বর্তমানে মানুষ যা জানে না ও ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হতে পারে সেগুলোসহ সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিদ গজানো:

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"ঐ বৃষ্টি দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য (নানারকম) শস্য এবং জলপাই, খেজুর, আঙ্গুর ও সবরকম ফল উৎপন্ন করেন। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।" (সূরা নাহল:১১)

বৃষ্টিপাত উদ্ভিদের জন্য একমাত্র প্রাকৃতিক পানির উৎস। মাটি পানি শোষণ করে এবং তা মূলের মাধ্যমে পাতা পর্যন্ত পৌঁছায়।

প্রতিটি উদ্ভিদের জেনেটিক গঠন ভিন্ন, তাই একই ধরণের জলবায়ু বা মাটিতেও ফল বা গাছের বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়।

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰي بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰي بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

পৃথিবীতে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং একাধিক মাথাবিশিষ্ট ও এক মাথাবিশিষ্ট খেজুরগাছ আছে যা একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়; তবে ফলের স্বাদে আমি এগুলোর কতককে কতকের চেয়ে উৎকৃষ্ট করে থাকি। এর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রাদ :৪)

একই পানি থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপন্ন হয় যা জেনেটিক বৈচিত্র্য।
গাছপালা শুধু খাদ্যই নয়; ঔষধ, বায়ু, ছায়া, বাসস্থান এমনকি মানসিক প্রশান্তিও দেয়। উদ্ভিদের উপকারিতা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআনের উদ্ভিদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতা নয়, রয়েছে স্পষ্ট জৈব ও প্রাকৃতিক জ্ঞানের ইঙ্গিত। পানি, বৃষ্টি, জোড়াবদ্ধ সৃষ্টি, বৃদ্ধির ধাপ, খাদ্যশৃঙ্খল—সবকিছুই আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদ্ভিদের সবুজ রং: মহান করুণাময় আলাহর সৃষ্টিতে গবেষণার মাধ্যমে মানুষ নতুন নতুন তথ্য ও রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। তবুও মানুষ বসে নাই এবং জানার অদম্য আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন যে উদ্ভিদে কীভাবে ফল হয়। তারা বর্ণনা করেন যে, পানি বর্ষিত হয়ে উদ্ভিদকে গজিয়ে দেয়। আর উদ্ভিদ পানি শোষণ করে সবুজ রঙ্গের

পদার্থ তৈরি করে। ইংরেজিতে ওকে ক্লোরোফিল বলা হয়। এটাই সেই উপাদান যার দ্বারা উদ্ভিদের বীজ ও ফল সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় ফল উৎপাদনের কারখানা সৃষ্টিকর্তার কুদরতের এই সবুজ কারখানা মাধ্যমের পানি, বাতাস, কার্বনডাই-অক্সাইড ও সূর্যের তাপ সুগারে পরিবর্তন হয়ে ফলে পরিণত হচ্ছে।

আলাহ তা'আলা বলেন:

" তিনি (আল্লাহ) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতপর আমি তা থেকে সবুজ শাখা বের করেছি, ফলতঃ তা থেকে আমি উপর্যুপরি বীজ উৎপন্ন করে থাকি খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, জয়তুন, আনার পরস্পর স্বাদৃশ্যশীল এবং স্বাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয়ই এ গুলোতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"(সূরা আনআম-৯৯)।

হাঁ, বিশ্বাসীদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এ সব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয়, একই সূর্যের আলো পায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এ সবের রং ও স্বাদ ভিন্ন, আকারেও পার্থক্য। এ যেন মহান সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক কুদরতের অটোমেটিক মেশিন। জ্ঞান বিজ্ঞানের এসব আবিষ্কারের ১৪০০ বছর পূর্বে এ ধরনের তথ্য কি ভাবে কুরআনে স্থান পেলো?

এ প্রশ্নের একমাত্র সঠিক জওয়াব এটাই যে, এই কিতাব কোন মানব রচিত বিধান নয় বরং মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ গ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

■ জীববিজ্ঞান ■

জীববিজ্ঞান হলো জীবনের বিজ্ঞান—যেখানে জীবনের উৎপত্তি, গঠন, প্রজনন, বৃদ্ধি, কোষ, জিন, পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে, কোরআনে জীববিজ্ঞানের অনেক মৌলিক বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো আধুনিক বিজ্ঞান মাত্র সাম্প্রতিক যুগে আবিষ্কার করেছে।

প্রাণের উৎপত্তি পানির মাধ্যমে:

আজকের জীববিজ্ঞান বলে—সব জীবের মধ্যে পানি একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। কোষের ভিতরে থাকা সাইটোপ্লাজম মূলত পানি-ভিত্তিক।

কোরআন বলছে_

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ؟

" এবং *আমি প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?"*

(সূরা আম্বিয়া ২১:৩০)

সুতরাং, জীবনধারণে পানি অপরিহার্য—এটি কোরআন অনেক আগেই বলে দিয়েছে।

মানব সৃষ্টির ধাপ:

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে... তারপর তাকে একটি নির্ধারিত স্থানে (জায়গায়) শুক্রবিন্দু হিসেবে স্থাপন করেছি। এরপর আমি তাকে জমাট রক্ত (আলাকা) করেছি, অতঃপর মাংসপিণ্ড করেছি..."

(সূরা মু'মিনুন :১২–১৪)

এই আয়াতে মানব ভ্রূণের বিকাশধাপের একটি পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে:

নুতফা (স্পার্ম/ডিম্বানু)➤আলাকা (জমাট রক্ত/জীবাণুর মতো ঝুলন্ত বস্তু)➤মুদগা (চিবানো মাংসের টুকরা)

আধুনিক এমব্রিওলজিতে এই ধাপগুলো যথার্থভাবে স্বীকৃত, যা ড. কেইথ মুর সহ বহু বিজ্ঞানীও স্বীকার করেছেন।

সৃষ্টির যুগপৎ জোড়া সৃষ্টি:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

"মহিমা সেই পবিত্র সত্তার, যিনি জমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদের ও তাদের নিজেদের (অর্থাৎ মানুষের) এবং তারা যাদের কথা জানে না তাদের সব জোড়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ইয়াসিন:৩৬)

আজকের জেনেটিক্স বলে, সব জীবেই জোড়াভিত্তিক পুনর্জনন হয়—যেমন পুরুষ ও নারী (XY/XX)। এমনকি উদ্ভিদ ও ব্যাকটেরিয়াতেও কিছু জোড়ার ভিত্তিতে গঠন রয়েছে।

দুধ উৎপাদনের পদ্ধতি:

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

"গবাদিপশুর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আমি তাদের পেটের ভিতরের গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে খাঁটি দুধ (বের করে) তোমাদেরকে পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক।"(সূরা নাহল:৬৬)

গবাদিপশুর খাদ্য হজম হয়ে রক্তে শোষিত হয় এবং স্তন্যগ্রন্থির মাধ্যমে দুধ উৎপন্ন হয়, যা শরীর থেকে এক প্রাকৃতিক ও পুষ্টিকর তরল হিসেবে বের হয়। কোরআনের এই বর্ণনা অত্যন্ত সঠিক।

মানবদেহের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۖ

"অবশ্যই আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা তীন:৪)

মানুষের মস্তিষ্ক, চিন্তাশক্তি, ভাষা, নৈতিকবোধ, শারীরিক কাঠামো সবকিছু তাকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করেছে।

মানবজন্মে বংশগতি পুরুষ ও নারীর উভয় ভূমিকা:

প্রাচীনকাল পর্যন্ত অনেকে ভাবত, জন্মের জন্য শুধু পুরুষের স্পার্মই যথেষ্ট।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান জানায়, উভয়ের (পুরুষের স্পার্ম এবং নারীর ডিম্বানু) সম্মিলনে মানবজন্ম ঘটে।

যা কোরআন নিখুঁতভাবে উল্লেখ করেছে।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰۤي ۙ

"এবং শপথ সেই মহান সত্তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন!"(সূরা লাইল:৩)

مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۙ

"বীর্য থেকে; তিনি তাকে সৃষ্টি করেন ও পরিমিতভাবে গঠন করেন।" (সূরা আবাসা:১৯)

■ প্রাণীবিজ্ঞান ■

প্রাণিবিজ্ঞান হলো জীবজগৎ বিশেষ করে প্রাণীর গঠন, আচরণ, বংশবিস্তার, পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার বিজ্ঞান। আশ্চর্যজনকভাবে, কোরআনে ১৪০০ বছর আগেই প্রাণিজগৎ সম্পর্কে কিছু নির্ভুল ও বাস্তবভিত্তিক তথ্য রয়েছে যা আধুনিক জীববিজ্ঞানের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে মিল রয়েছে।

জীবের জোড়ায় সৃষ্টি:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

"মহিমা সেই পবিত্র সত্তার, যিনি জমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদের ও তাদের নিজেদের (অর্থাৎ মানুষের) এবং তারা যাদের কথা জানে না তাদের সব জোড়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ইয়াসিন:৩৬)

প্রাণিজগতে প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী থাকে, যার মাধ্যমে প্রজনন ও বংশগতি ঘটে। এমনকি কিছু অজানা মাইক্রো অর্গানিজম ও জিন এর মধ্যেও জোড়ার ভিত্তি রয়েছে।এটি আধুনিক জেনেটিক্সের মূল ভিত্তি।

জীবের প্রকারভেদ:

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰي بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰي رِجْلَيْنِ ۚ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰي اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“আল্লাহ সকল জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে কতগুলো পেটে ভর দিয়ে চলে, কতগুলো দুই পায়ে হাঁটে, আবার কতগুলো চার পায়ে হাঁটে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।”(সূরা নূর:৪৫)

এই আয়াতে প্রাণীদের প্রধান শ্রেণিবিন্যাসের উল্লেখ আছে_
সাপ বা পোকামাকড়ের মতো পেটে হেঁটে চলা;পাখি ও মানুষের মতো দুই পায়ে; স্তন্যপায়ী ও চতুষ্পদ জন্তুদের মতো চার পায়ে চলা।

মৌমাছির জীবনব্যবস্থা: মৌমাছির জটিল সমাজব্যবস্থা, কর্মবণ্টন ও ঘর নির্মাণ বিজ্ঞানীদের চমকে দেয়।
তাদের ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহ করে মধু তৈরি করা এবং নির্দিষ্ট পথ ধরে চলা (navigation) কোরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তোমার পালনকর্তা মৌমাছিকে বলেছেন, “তোমরা ঘর বানাও পাহাড়ে, গাছে আর মানুষেরা যা নির্মাণ করে তাতে।তারপর সবরকম ফল থেকে আহার করো এবং তোমাদের প্রভুর সুগম পথসমূহে চল।” এই মৌমাছির পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় (মধু) বের হয়, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য আছে। এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে। (সূরা নাহল:৬৮–৬৯)

পশুপালনের উপকারিতা:

۫ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ

“তিনি তোমাদের জন্য গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন। এগুলোতে তোমাদের জন্য তাপগ্রহণের (শীতবস্ত্র তৈরির) উপকরণ ও আরো অনেক উপকার আছে। এদের থেকে তোমরা খাদ্যও পেয়ে থাক।”(সূরা নাহল :৫)

□ وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ

“গবাদিপশুর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে তোমাদেরকে (দুধ) পান করাই। তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের মাংস খাও।” (সূরা মু'মিনুন:২১)

গবাদিপশু থেকে আমরা দুধ, মাংস, চামড়া, পশম, সার ইত্যাদি পাই। এছাড়াও, আধুনিক গবেষণা বলছে—গবাদিপশুর দুধ ও দুধজাত খাদ্য প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস, যা কোরআনের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পাখির উড়ার নিয়ম:

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَي الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ

"তারা কি তাদের (মাথার) ওপরে ডানা ছড়িয়ে দেওয়া ও গুটিয়ে রাখা পাখিদেরকে দেখে না? করুণাময় আল্লাহই তাদেরকে (তাদের গতিপথে) ধরে রাখেন (স্থির রাখেন)। তিনি সবকিছুই দেখতে পান।" (সূরা আল-মুলক:১৯)

পাখির উড়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—aerodynamics, wing pressure, lift ও balance—এসব আধুনিক বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। কোরআন বলছে, এটি আল্লাহর নির্দেশ ও ভারসাম্যের কারণে সম্ভব।

উটের গঠনের বিস্ময়:

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَي الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ٗ

"তারা কি তাহলে উটগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, কীভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে?"(সূরা গাশিয়া:১৭)

উট হলো মরুভূমির "জীবন্ত পানির ট্যাঙ্ক"। এর
পায়ের নিচের মোটা চামড়া,
নাকের বিশেষ ছাঁকনি
পানিশূন্যতায় সহ্যক্ষমতা
সবই মরুভূমির জন্য উপযোগী। কোরআনে উটের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে।
প্রাণিজগৎ সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনাগুলো শুধু সাধারণ তথ্য নয়, বরং এতে বিজ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। প্রজনন, সমাজব্যবস্থা, উপকারিতা, নকশা ও সৃষ্টির পদ্ধতি—সবই আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানের মূল বিষয়। যা কোরআনের নির্দেশনা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দলবদ্ধতা: গবেষণায় প্রমাণিত যে, প্রাণী ও পাখি দলগতভাবে বাস করে। তারা সুসংগঠিত হয় এবং একত্রে কাজ ও বসবাস করে।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَأَطَٰئِرِ يُطِيرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَمَ امْثَالِ بِجَنَاحَيْهِ

"*ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, আর দু'ডানা দ্বারা উড়ন্ত এমন কোন পাখি নেই, যারা তোমাদের মত একটি উম্মাত নয়।"(সূরা আন-আনআম: ৩৮)*

পাখির উড্ডয়ন: আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, নির্দিষ্ট প্রজাতির এমন কিছু পাখি রয়েছে, যাদের চলাচলে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচীর উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। পাখির 'genetic code' এ সঞ্চিত গমনাগমন সম্পর্কিত কর্মসূচীর কারণেই এ ধরণের পাখির বাচ্চারা পর্যন্ত দীর্ঘ ও দুর্গম যাত্রাপথের উদ্দেশ্যে সফরে সাফল্য অর্জনে সক্ষম। যাদের দেশান্তরে গমনাগমনের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা এমনকি কোন পথ নির্দেশনাও থাকে না।
শুধু তাই নয়, একইভাবে তারা যে জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যথারীতি সে স্থানে ফিরেও আসে।

الَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيرِ مُسخَّرَتْ فِي جَوَ السَّمَاءِ طَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ طَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"*তারা কী উড়ন্ত পাখিকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীসের জন্যে রয়েছে নিদর্শনাবলী।" (নাহল: ৭৯)*

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَي الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰفَّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ

"তারা কি তাদের (মাথার) ওপরে ডানা ছড়িয়ে দেওয়া ও গুটিয়ে রাখা পাখিদেরকে দেখে না? করুণাময় আল্লাহই তাদেরকে (তাদের গতিপথে) ধরে রাখেন (স্থির রাখেন)। তিনি সবকিছুই দেখতে পান।"(সূরা মূলক:১৯)

মৌমাছি: কোন নতুন বাগান বা ফুলের সন্ধান পেলে মৌমাছিটি আবার মৌচাকে ফিরে যায় এবং তার সহকর্মী মৌমাছিদেরকে সেখানে যাওয়ার সঠিক গতিপথ ও মানচিত্র 'মৌমাছির নৃত্য' নামক আচরণের মাধ্যমে তা জানায়। অন্যান্য কর্মী মৌমাছিকে তথ্য জানানোর উদ্দেশ্যে এ ধরণের আচরণ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

ۙ وَاَوْحٰي رَبُّكَ اِلَي النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ
ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۭ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ
شِفَاۗءٌ لِّلنَّاسِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"*তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, বাসা তৈরি কর পাহাড়ে, বৃক্ষে আর উঁচু ডালে। অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের (শিখানো) সহজ পদ্ধতি মেনে চল।"(সূরা আন-নাহল: ৬৮-৬৯"*

স্ত্রী মৌমাছি হচ্ছে কর্মী মৌমাছি বা সৈনিক মৌমাছি। সূরা আল-নাহলের ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে মৌমাছির জন্য স্ত্রী লিঙ্গ كُلِ ও فَاسْلُكِى ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ যেসব মৌমাছি খাদ্য সংগ্রহের কাজ করে তা স্ত্রী মৌমাছি। অন্যকথায় সৈনিক বা কর্মী মৌমাছি হচ্ছে স্ত্রী মৌমাছি।

মৌমাছিরা হল সৈনিক এবং তাদের একটি রাজা রয়েছে। শেক্সপিয়ারের যুগে মানুষ মৌমাছি সম্পর্কে এরকমই ধারণা করত। তারা মনে করত যে, কর্মী মৌমাছিরা পুরুষ এবং ঘরে ফিরে তাদেরকে একটি রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করতে হয়। যাহোক এটা সত্য নয়। কর্মী মৌমাছিরা হল স্ত্রী এবং তারা রাজা মৌমাছির কাছে নয় বরং রাণী মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। কিন্তু এ বিষয়টি মাত্র ৩০০ বছর পূর্বে আধুনিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

মধু: মৌমাছি বিভিন্ন প্রকারের ফুল ও ফলের রস আহরণ করে এবং নিজের শরীরের ভিতরে মধু তৈরির পর তা মোমের কোষে জমা করে। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে মানুষ জানতে পেরেছে যে, মধু মৌমাছির পেট থেকে আসে। অথচ এ ধ্রুবসত্যটি ১৪০০ বছর আগে কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে।

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

"*তাদের পেট থেকে বেরিয়ে আসে একটি পানীয়, বিচিত্র যার বর্ণ, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগমুক্তি।" [আন-নাহল: ৬৯]*

মধুর রোগ নিরাময়ের গুণ রয়েছে এবং এটা মৃদু অ্যানটিসেপটিক জাতীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ানরা ক্ষত শুকানোর জন্য মধু ব্যবহার করতো। মধুর ঘনত্বের কারণে ক্ষত স্থানে কোন ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া জন্মাতে পারে না।

বিশেষ গাছের এলার্জিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে সেই গাছের মধু খাওয়ালে তার সেই এলার্জির প্রতিরোধক্ষমতা বাড়বে। মধু শর্করা ও ভিটামিন 'K' সমৃদ্ধ।

মাকড়সা:

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚۖ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

"যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য অভিভাবক গ্রহণ করে তাদের অবস্থা হল মাকড়সার অবস্থার মত, যে (নিজের জন্য) একটি ঘর বানায়। আর মাকড়সার ঘরই হল সবচেয়ে দুর্বল ঘর, যদি তারা জানত!"(সূরা আনকাবূত:৪১)

মাকড়সা তার শরীর থেকে এক ধরনের রেশমজাতীয় সুতা বের করে জাল বুনে।জালের গঠন জ্যামিতিকভাবে নিখুঁত, কিন্তু দুর্বল—কারণ এটি হাওয়ায় বা স্পর্শেই ছিঁড়ে যায়।

আয়াতে মাকড়সার ঘরকে সবচেয়ে দুর্বল বলা হয়েছে। বাস্তবে, মাকড়সার জাল খুব হালকা এবং অস্থায়ী। বিজ্ঞান বলছে, এটি শিকারের ফাঁদ হলেও বাসস্থান হিসেবে এটি দুর্বল এবং ক্ষণস্থায়ী।

মাকড়সার পারিবারিক আচরণ:

কিছু প্রজাতির মাকড়সার মধ্যে স্ত্রী মাকড়সা প্রজননের পর পুরুষকে খেয়ে ফেলে।

এমন আচরণ পারিবারিক বন্ধনের পরিপন্থী, যা কোরআনের "দুর্বল ঘর" প্রতীকের সঙ্গে মিলে যায়।

পিঁপড়া: আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত, পিপঁড়ারা কম্পন ও স্পর্শের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কোরআনে একটি পিপঁড়ার সতর্কবার্তা দেওয়া উল্লেখ রয়েছে যা একটি উন্নত সতর্কতা ও সমাজচেতনার প্রমাণ।

حَتّٰٓي اِذَآ اَتَوْا عَلٰي وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

"যখন তারা পিঁপড়াদের উপত্যকায় এল তখন একটি পিঁপড়া বলল, "হে পিঁপড়ারা! তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করো; যাতে সোলায়মান ও তার সৈন্যরা অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষে না ফেলে।"(সূরা নামল:১৮)

পিপঁড়াদের কলোনিতে রানী, শ্রমিক ও সৈনিক থাকে। প্রত্যেকের কাজ নির্ধারিত থাকে। যেমন: খাবার সংগ্রহ, বাসা বানানো, ডিম রক্ষা ইত্যাদি।

মেয়েলি পিপঁড়া:

আয়াতে "قالت نملة" বলা হয়েছে, যার অর্থ "একটি মেয়ে পিপঁড়া বলল"। আশ্চর্যের বিষয়, পিপঁড়া সমাজে কাজ করে কেবল স্ত্রী পিপঁড়ারাই—পুরুষ পিপঁড়া ডিম দেওয়ার পর মারা যায়। কোরআনের ভাষার এই সূক্ষ্মতা আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানের সাথে হুবহু মিলে যায়।

■ ভ্রুনতত্ত্ব ■

ভ্রুনতত্ত্ব হচ্ছে মানুষের জন্মের পূর্বের বিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞানালোচনা।
ড. মূর বলেন যে, ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কুরআনে ও হাদীসে উল্লিখিত অধিকাংশ তথ্য ভ্রূণতত্ত্বের আধুনিক আবিষ্কারের সাথে হুবুহু মিলে যায় এবং কোনক্রমেই এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা যায় না।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

"পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।"(সূরা আলাক্ব: ১-২)

আরবী শব্দ ('আলাক্ব') এর অর্থ 'জমাট রক্ত' ছাড়াও আরেকটি অর্থ রয়েছে, তা হল, জোঁকের মত এক প্রকার বস্তু যা দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে।

ড. মূর জানতেন না যে, প্রাথমিক দশায় একটি ভ্রূণকে জোঁকের মত দেখায় কিনা। একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ভ্রূণের প্রাথমিক দশা পরীক্ষা করতে গবেষণা শুরু করেন এবং দেখেন যে, প্রাথমিক দশায় ভ্রূণের আকৃতির সাথে একটি জোঁকের আকৃতি মিল রয়েছে। এ দুইয়ের মধ্যে বিস্ময়কর মিল দেখে তিনি অভিভূত হন।
তিনি বলেন, 'কুরআনের মাধ্যমে মানুষের বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে সাহায্য করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে এগুলো যে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে তা আমার কাছে পরিষ্কার, কারণ এগুলোর অধিকাংশ জ্ঞান বহু শতাব্দি পরেও আবিষ্কৃত হয়নি। তাছাড়া আমার কাছে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) অবশ্যই আল্লাহর নবী।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কিথ মুর কোরআনে মানব ভ্রূণবিকাশের বর্ণনা দেখে বিস্মিত হন এবং বলেন এগুলো আধুনিক মাইক্রোস্কোপ ছাড়াও বলা অসম্ভব ছিল।

মেরুদণ্ড ও পাজর থেকে সৃষ্টি:

মানব সৃষ্টির উৎস এবং তার উপাদান নিয়ে কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও আভিধানিক রূপে ব্যাখ্যা এসেছে। সূরা আত-তারিক-এ একটি ব্যতিক্রমী আয়াত রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে এমন এক তরল পদার্থ থেকে, যা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে নির্গত হয়। এই আয়াতটি কেবল ধর্মীয় নয়, আধুনিক জীববিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করলেও গভীর তাৎপর্য প্রকাশ পায়।

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

"মানুষ যেন লক্ষ্য করে, সে কী হতে সৃষ্টি হয়েছে। সে সৃষ্টি হয়েছে এক প্রবাহমান তরল থেকে, যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে।" সূরা আত-তারিক (৮-১০)

الصُّلْب অর্থ মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠদেশের হাড় التَّرَائِب অর্থ বুকের হাড় বা পাঁজরের হাড়।

আয়াতটি এমন এক তরলের কথা বলছে, যা মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উৎস এবং তা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মাঝামাঝি স্থান থেকে নির্গত হয়।

এই আয়াতে ব্যবহৃত "সুল্ব" (الصُّلْب) শব্দের অর্থ হচ্ছে মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠদেশের হাড়। আধুনিক জীববিজ্ঞানে জানা যায়, পুরুষের অণ্ডকোষ ভ্রূণ অবস্থায় গঠিত হয় মেরুদণ্ড সংলগ্ন অঞ্চলেই, বিশেষ করে কোমরের নিচের দিকে। পরবর্তীতে তা শরীরের নিচের অংশে নেমে যায়। ফলে, "মেরুদণ্ড থেকে নির্গত পানি" — এই কুরআনিক ভাষা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও যথার্থতা পায়।

অন্যদিকে, "তরায়িব" (التَّرَائِب) শব্দটির অর্থ বুকের হাড় বা পাঁজর। নারী দেহে সন্তান ধারণ এবং প্রজনন প্রক্রিয়া অনেকাংশে শরীরের ঊর্ধ্বাংশের হরমোন নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষিত অঙ্গগুলোর ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে ডিম্বাশয় ও জরায়ু যেমন তলপেটের ভেতরে অবস্থিত, তেমনি শরীরের উপরিভাগের হরমোন নিঃসরণ ও স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণও এতে যুক্ত থাকে। ফলে নারীর শারীরিক গঠন এবং প্রজননের পরিপূর্ণ প্রক্রিয়া পাঁজর বা বুকের হাড়ের সঙ্গে আংশিক সম্পর্কযুক্ত বলেও বিবেচনা করা যায়।

তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি: মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যে থেকে নির্গত তরল পদার্থের ফোঁটা

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ- يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

"*সুতরাং মানুষ ভেবে দেখুক কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে বের হয়ে আসা পানি থেকে। তা বের হয় পুরুষের যৌন স্থান ও স্ত্রীর যৌন স্থানের সম্মিলনের (পরিনতিতে)।" (সূরা আত্ব-ত্বারিক্ব:৫-৭)*

পবিত্র কুরআন মানুষকে 'নুতফাহ' থেকে সৃষ্টি করার কথা বলে, যার অর্থ অতি সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ অথবা কোন কাপের নীচের তলায় অবশিষ্ট কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ।

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ

“অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।”(আল মুমিনুন:১৩)

সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান নিশ্চিত করেছে যে, ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য গড়ে তিন মিলিয়ন শুক্রকীটের মধ্য থেকে মাত্র একটি শুক্রকীট প্রয়োজন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ مَّاء مَّهِينٍ

"*অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন, তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।"(সূরা সাজদাহ:৮)*

আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, পুরুষের দেহে উৎপন্ন কয়েক মিলিয়ন শুক্রাণু থেকে ডিম্বাণুতে প্রবেশকারী একটি মাত্র শুক্রাণুই নিষিক্তকরণের জন্য প্রয়োজন হয়। কয়েক মিলিয়ন থেকে ঐ একটি মাত্র শুক্রাণুকেই কুরআনে 'সুলালাহ' বলা হয়েছে।
আমরা বর্তমানে এটাও জানতে পেরেছি যে, নারীদেহে উৎপন্ন দশ হাজারের অধিক ডিম্বাণু থেকে একটি মাত্র ডিম্বাণুই নিষিক্ত হয়। দশ হাজার ডিম্বাণু থেকে ঐ একটি ডিম্বাণুকে কুরআনে 'সুলালাহ' বলা হয়েছে। তরল পদার্থ থেকে সুষমভাবে বের করে আনার অর্থেও 'সুলালাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاج

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে।"(আদ-দাহরঃ ২)

আরবী শব্দ نطفة أمشاج)-এর অর্থ হচ্ছে, মিশ্রিত তরল পদার্থ। কুরআনের অনেক তাফসীরকারকের মতে, মিশ্রিত তরল পদার্থ বলতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ জাতীয় ধারক বা তরল পদার্থকে বোঝায়।

পানি থেকে সৃষ্টি: জীববিজ্ঞানে প্রমাণিত যে জীবনের মৌলিক একক—সেল (কোষ) জীবিত থাকতে হলে পানি অপরিহার্য। কোষের ৭০-৯০% পানি দিয়ে গঠিত।

বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে সমুদ্রের বুকে প্রাচীন বস্তুকণা থেকে প্লাটোপ্লাজম-এর উৎপত্তি হয়। এই প্লাটোপ্লাজম থেকেই জন্ম নেয় এমিবা নামের ক্ষুদ্রতম এককোষী প্রাণী। এভাবে সমুদ্রের উৎস থেকে পৃথিবীর বুকে প্রাণীর জন্ম হয়েছে।

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমুদ্র থেকেই সকল প্রাণীর জন্ম। অর্থাৎ সমুদ্র বা পানিই হচ্ছে সকল প্রাণের উৎস। এই তথ্য বিজ্ঞানীরা আমাদের জানিয়েছেন মাত্র কিছুদিন পূর্বে।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“আর প্রাণবন্ত সব কিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। এর পরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?”(আম্বিয়া: ৩০)

এই পৃথিবীতে মানুষ এমন অনেক কিছু ভোগ করে এবং চোখে তা দেখে, জ্ঞানে ধরা পড়ে এসব হলো আল্লাহ তা'য়ালার প্রকাশ্য নেয়ামত। আর যেসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না এবং অনুভবও করতে পারে না সেগুলো হলো আল্লাহ তা'য়ালার গোপন নেয়ামত। স্বয়ং মানুষের নিজের দেহে এমন অনেক কিছু কাজ করে যাচ্ছে এবং দেহের বাইরে পৃথিবীর পরিবেশে মানুষের স্বার্থে কল্যাণময় ভূমিকা পালন করছে এমন অগণিত জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু মানুষ এসব সম্পর্কে জানেও না যে, মহান আল্লাহ তাকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য, তার প্রতিদিনের আহারের জন্য, তার দেহের জীব কোষ বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশের জন্য এবং তার অন্যান্য কল্যাণ্যের জন্য নানা ধরনের উপকরণ থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানের নানা শাখায় মানুষ যতই গবেষণা করছে ততই মানুষের সামনে আল্লাহ তা'য়ালার এমন অগণিত নেয়ামত স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হচ্ছে যে, এসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষের কোন পূর্ব ধারণাও ছিল না। পক্ষান্তরে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই মানুষ আল্লাহর যেসব নেয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, সেগুলো ঐসব নেয়ামতের তুলনায় অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ, যেসব নেয়ামত বর্তমান সময় পর্যন্তও মানুষের জ্ঞানের অগোচরে রয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানি থেকেই প্রথমে জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব হয়েছে। অথচ চৌদ্দ শত বছর পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে পৃথিবীবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছেন যে, 'পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে পানি থেকে।'

অথচ তিনি কোন দিন কোন বিজ্ঞান গবেষণাগারে গবেষণা করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা সেই মহামানবের মুখ দিয়েই উচ্চারিত করালেন-

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي

“আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি।”(সূরা আম্বিয়া-৩০)

জীবন্ত বস্তু বলতে শুধু মানুষকেই বুঝানো হয় না। সৃষ্ট জগতের অসংখ্য জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ এবং উদ্ভিদসমূহও জীবন্ত বস্তুর মধ্যে শামিল রয়েছে। প্রজননের মাধ্যমেও জীবের জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রেও পানি অপরিহার্য। জীব কোষের পদার্থসমূহের অধিকাংশই পানি এবং অতি সামান্য অংশ রয়েছে অন্যান্য পদার্থ। পানি ব্যতিত জীব কোষ জীবিত থাকতে পারে না এবং কোন ধরনের জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি করেছেন পানি থেকে। পৃথিবীতে জীব টিকে থাকা ও বিকাশের জন্যও পানি একান্তই প্রয়োজন। কত পানি যে আল্লাহ এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তা কল্পনাও করা যায় না। জীবন ধারনের জন্য পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য নদী-নালা, ডোবা-পুকুর, হ্রদ, সাগর, মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। এরপরেও আল্লাহ তা'য়ালা মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এসব কিছুই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।

ভ্রুণের পর্যায়সমূহ:

মানব সৃষ্টির ভ্রূণ অবস্থার বিবরণ কুরআনে বিস্ময়করভাবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে, যা আধুনিক জীববিজ্ঞানের সাথে অনেকাংশে মিলে যায়।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍۢ مِّن طِينٍۢ - ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةًۭ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍۢ - ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةًۭ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةًۭ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًۭا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًۭا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ-

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সে মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করেছি। নিপুনতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।" (সূরা আল-মুমিনুনঃ ১২-১৪)

ভ্রূণের ধাপসমূহ:

নুতফাহ (□□□□□□□) — শুক্রবিন্দু / তরল ড্রপ

এটি হল পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাণুর সংমিশ্রণ যা গর্ভে নিষিক্ত হয়।বিজ্ঞান অনুযায়ী, fertilization-এর পর সেল বিভাজন শুরু হয় এবং ভ্রূণ তৈরি হয়।

আলাকাহ (□□□□□□□) — ঝুলন্ত বস্তু / জোঁকের মতো

এই পর্যায়ে ভ্রূণ জরায়ু প্রাচীরে ঝুলে থাকে এবং দেখতে অনেকটা জোঁকের মতো।আধুনিক আল্ট্রাসাউন্ড চিত্রেও ২০–২৫ দিনের ভ্রূণ এই রকম দেখায়।

মুদগাহ (□□□□□□□) — চিবানো গোশতের মতো

ভ্রূণ এ সময় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ছোট ছোট অংশে ভাগ হতে থাকে, যার কারণে এটি চিবানো গোশতের মতো দেখায়।

হাড়ের গঠন ও মাংস পরানো

এরপর হাড় গঠিত হয় এবং পরে সেই হাড়ের ওপর মাংস গঠিত হয়।

নতুন সত্তা (□□□ □□□□□)

এই ধাপটি হলো আত্মার সংযোগ, মানবচেতনাসম্পন্ন একটি পরিপূর্ণ জীব — যা কেবল কোষের সমষ্টি নয়, বরং স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব আজ যা ব্যাখ্যা করে, কুরআন তা সংক্ষিপ্ত, প্রতীকী ও সাহিত্যমূলক ভাষায় ১৪০০ বছর আগেই বলেছে। সৌদি আরব এবং পশ্চিমা দেশের অনেক জীববিজ্ঞানী যেমন প্রফেসর কিথ মুর এই সাদৃশ্যকে গভীরভাবে প্রশংসা করেছেন।

ভ্রূনের লিঙ্গ নির্ধারণ: মানুষের লিঙ্গ (নারী বা পুরুষ) নির্ধারণ নিয়ে বহু যুগ ধরে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজে নানা ধারণা প্রচলিত ছিল। অনেকে মনে করত যে, সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা নারীর শরীর বা প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু আধুনিক জেনেটিক্স প্রমাণ করেছে — ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের মূল উৎস পুরুষের শুক্রাণু।

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ হয় ক্রোমোজোমের মাধ্যমে। প্রত্যেক মানুষের শরীরে ২৩ জোড়া করে মোট ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। এর মধ্যে একটি জোড়া লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোম হিসেবে কাজ করে।

নারীর ডিম্বাণু সবসময় X ক্রোমোজোম বহন করে। কিন্তু পুরুষের শুক্রাণু হতে পারে X অথবা Y ধরনের। যদি ডিম্বাণুর সঙ্গে X ক্রোমোজোমধারী শুক্রাণু নিষিক্ত হয়, তাহলে ভ্রূণ হবে মেয়ে (XX)। আর যদি Y ক্রোমোজোমধারী শুক্রাণু নিষিক্ত হয়, তাহলে ভ্রূণ হবে ছেলে (XY)।

অর্থাৎ, সন্তানের লিঙ্গ হবে ছেলে না মেয়ে — তা নির্ভর করে পুরুষের শুক্রাণুর ওপর, নারীর ডিম্বাণুর ওপর নয়।

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

“সে কি ছিল না এক বীর্যবিন্দু যা নিষিক্ত হয়েছিল? এরপর সে হয়েছিল আলাকাহ, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন ও সুসমঞ্জস করেছেন। এবং তিনি তা থেকেই করেছেন যুগল নারী ও পুরুষ।”(সূরা আল-কিয়ামাহ (৭৫:৩৭–৩৯)

এই আয়াতে ‘مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ’ অর্থাৎ ‘নিষিক্ত বীর্যবিন্দু’ বলা হয়েছে — এবং সেখান থেকেই নারী ও পুরুষ যুগল সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, লিঙ্গ নির্ধারণের উৎস পুরুষের বীর্য-এটি সরাসরি বলা হয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলে যায়।

■ মানবদেহ ■

মানবদেহের গঠন একটি বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম জৈবিক প্রক্রিয়া, যা দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোষ বিভাজন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুনির্দিষ্ট বিন্যাসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আধুনিক জীববিজ্ঞান এই প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করলেও আল-কুরআনে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বেই এ বিষয়ে স্পষ্ট ও ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়, যা সমসাময়িক বিজ্ঞানের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আধুনিক জীববিজ্ঞানে ভ্রূণ গঠন প্রক্রিয়া:

মানবজীবনের সূচনা ঘটে নুতফা নামক একক কোষ (zygote) থেকে, যা শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংমিশ্রণে গঠিত হয়। এরপর এই কোষ জরায়ুর দেয়ালে সংযুক্ত হয়ে বিভাজিত হতে থাকে:

1. নুতফা (Nutfah): নিষিক্ত ডিম্বাণু, যা জীবনের সূচনা।
2. আলাকা (Alaqah): একটি ঝুলন্ত ও রক্তপিণ্ড সদৃশ গঠন, যা জরায়ুর প্রাচীরে লেগে থাকে।
3. মুদগাহ (Mudghah): চিবানো মাংসপিণ্ডের মতো অবস্থা, যাতে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপরেখা গঠিত হয়।
4. ইযাম (অস্থি): কঙ্কালের প্রাথমিক গঠন শুরু হয়।
5. লাহম (মাংস): হাড়ের চারপাশে মাংসপেশি গঠিত হয়।
6. রূহ (চেতনা): জীববিজ্ঞানে যাকে বলা হয় নিউরোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা চেতনার সঞ্চার।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি গর্ভধারণের প্রায় ৪০ সপ্তাহে সম্পন্ন হয়।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"অতঃপর আমি নুতফাহকে আলাকা করেছি, এরপর আলাকাকে মুদগাহ করেছি, তারপর মুদগাহকে অস্থিতে রূপান্তর করেছি, এরপর অস্থিতে আমি মাংস পরিধান করিয়েছি; তারপর আমি তাকে এক ভিন্ন সৃষ্টিতে রূপান্তর করেছি। অতএব কতই না বরকতময় আল্লাহ, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা!"(সূরা আল-মু'মিনূন:১৪)

এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দগুলো যেমন

"خلقًا آخر" ও ,"نطفة" ,"علقة" ,"مضغة" ,"عظام" ,"لحم"

ধাপে ধাপে মানবদেহ গঠনের স্বতন্ত্র পর্যায়সমূহকে নির্দেশ করে।

নৈতিকতা:

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ ۚ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

"কখনো না, যদি সে (তার এহেন আচরণ থেকে) বিরত না হয় তাহলে অবশ্যই আমি মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে (তাকে) টেনে আনব।এক মিথ্যাবাদী,পাপী কেশগুচ্ছ।"(আল-আলাক:১৫-১)

نَاصِيَةٍ বলতে বোঝানো হয়েছে মাথার সামনের অংশ,যা আধুনিক বিজ্ঞান মতে নৈতিকতার কেন্দ্র। এই ধরনের নির্দিষ্টতা ৭ম শতকে কারো জানা ছিল না।

লিঙ্গ নির্ধারণ ও জিন:

লিঙ্গ নির্ধারণ হয় পুরুষের Y বা X ক্রোমোজোম দ্বারা। নারী সবসময় X ক্রোমোজোম দেয়।

"সে কি ছিল না এক ফোঁটা বীর্য? তারপর সে হয়ে গেল সৃষ্টি। এবং তিনি সৃষ্টি করলেন তার থেকে নারী ও পুরুষ।"(সূরা কিয়ামাহ:৩৭-৩৯)

কোরআন বলছে লিঙ্গ নির্ধারণ হয় বীর্য থেকে, যা আধুনিক জেনেটিকস অনুযায়ী পুরুষের ক্রোমোজোম দ্বারাই হয়ে থাকে।

শ্রবণ, দৃষ্টি ও হৃদয়: মানব শরীরের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয়—এই তিনটি উপাদান শুধু জৈবিক অঙ্গ নয়, বরং মানবচেতনাকে গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক জীববিজ্ঞান এই অঙ্গগুলোর কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করে মানুষের জ্ঞান, অনুভব এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছে। একই সঙ্গে, আল-কুরআন বারবার এই তিনটি উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত করেছে শুধু শারীরিকভাবে নয়, বরং আত্মিক ও নৈতিক অর্থেও।

শ্রবণ (Hearing):

ভ্রূণ গঠনের প্রাথমিক ধাপেই শ্রবণ অঙ্গ—অর্থাৎ কানের গঠন শুরু হয়। গবেষণায় দেখা যায়, ১৮তম সপ্তাহের মধ্যেই ভ্রূণ শব্দ অনুভব করতে পারে। শ্রবণপ্রক্রিয়া মানুষের চারপাশের তথ্য সংগ্রহের প্রধান মাধ্যম।

দৃষ্টি (Vision):

দৃষ্টিশক্তির জন্য প্রধান অঙ্গ হলো চোখ, যা ভ্রূণের গঠনে কিছুটা পরে (প্রায় ২০তম সপ্তাহ থেকে) কার্যকর হয়। চোখের রেটিনা, কর্নিয়া ও অপটিক নার্ভ মানুষের বাইরের জগত পর্যবেক্ষণের মূল উপাদান।

হৃদয় (Heart):

জৈবিকভাবে হৃদয় হলো এক প্রকার পাম্প, যা রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে শরীরকে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে। তবে আধুনিক নিউরোসায়েন্সে হৃদয়কে শুধু শারীরিক পাম্প নয়, বরং ইমোশন প্রসেসিং-এ জড়িত বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত স্নায়ু তন্ত্র মানুষের অনুভূতির অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে ভূমিকা রাখে।

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

"তিনি তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তরও দিয়েছেন।"সূরা সাজদা:৯)

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়—এই সমস্তই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"(বনী ইসরাঈল:৩৬)

শ্রবণ, দৃষ্টি ও হৃদয়—এই তিনটির সঠিক ক্রম কোরআনে যেভাবে বলা হয়েছে, তা আধুনিক জীববিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআনে সবসময় শ্রবণকে আগে, তারপর দৃষ্টি, এরপর হৃদয় বা অন্তঃকরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বৈজ্ঞানিকভাবে যৌক্তিক কারণ ভ্রূণের গঠনে প্রথম শ্রবণ অঙ্গ তৈরি হয়, তারপর দৃষ্টিশক্তি, এবং হৃদয় শুধু রক্ত পাম্প করে না, বরং অনুভূতি ও জ্ঞান প্রসেসিংয়ের অংশ হিসেবেও কাজ করে।

হাড় ও কোষ পুনর্গঠন: মানবদেহের প্রতিটি কোষ নির্দিষ্ট সময় পর ধ্বংস হয়ে নতুন কোষের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কোষ পুনর্গঠন বা পুনঃউৎপাদন। এর মাধ্যমে ত্বক, রক্ত, হাড়, যকৃতসহ বহু অঙ্গ নিজে নিজেই ক্ষয় থেকে পুনরুদ্ধার হতে পারে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এই ক্ষমতাকে মানবদেহের আত্মনির্মাণক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করে, বিশেষত হাড়ের পুনর্গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা ক্ষেত্র।

আধুনিক জীববিজ্ঞানে হাড় ও কোষ পুনর্গঠন:

কোষ পুনর্গঠন:

মানবদেহে প্রতিনিয়ত কোটি কোটি কোষ মৃত্যু বরণ করে এবং নতুন কোষ জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ:

ত্বক: গড়ে প্রতি ২৮ দিনে একবার সম্পূর্ণ নবীকরণ হয়।

রক্ত: লোহিত রক্তকণিকা প্রায় ১২০ দিনে পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত হয়।

যকৃত: এটি এমন একটি অঙ্গ, যা আংশিক কাটা হলেও পূর্ণরূপে গঠিত হতে পারে।

হাড় পুনর্গঠন:

হাড়ের কোষ প্রধানত দুই ধরনের:

Osteoblasts: নতুন হাড় তৈরি করে।

Osteoclasts: পুরনো হাড় ভেঙে ফেলে।

এই পুনর্গঠনের ফলে হাড় ভেঙে গেলেও সঠিক চিকিৎসা ও পুষ্টি থাকলে তা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।হাড়ের অভ্যন্তরে থাকা Bone Marrow থেকে নতুন রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়।

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝
قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ

“সে বলে, “(মৃতের) ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়গুলো কে জীবিত করবে?বল, সেগুলো তিনিই জীবিত করবেন যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।” (ইয়াসিন:৭৮-৭৯)

আধুনিক Regenerative Medicine ও Stem Cell Therapy এই আয়াতের সত্যতা ব্যাখ্যা করে। মৃত্যুর পর পুনঃসৃষ্টি বা repairing ক্ষমতা বোঝানো হয়েছে।

আঙুলের ছাপ: আঙুলের ডগায় যে রেখার মতো সূক্ষ্ম নিদর্শন থাকে, তাকেই আঙুলের ছাপ বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট বলা হয়। এটি প্রতিটি মানুষের জন্য একক ও অদ্বিতীয়। এমনকি যমজ ভাইবোনেরও আঙুলের ছাপ আলাদা হয়। এই ছাপ কখনো পরিবর্তিত হয় না, তাই এটি মানুষের পরিচয় শনাক্তে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।যেমন:পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগে অপরাধীর শনাক্তকরণে,বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে (নাগরিক নিবন্ধন, ব্যাংকিং, ইত্যাদি),আধুনিক প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায়।

বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আঙুলের ছাপ গঠন হয় ভ্রূণের গর্ভাবস্থার **১০–১৬** সপ্তাহের মধ্যে, এবং এটি আজীবন অপরিবর্তিত থাকে।
بَلَىٰ قَـٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ

“না, বরং আমি তার আঙুলের ডগাসমূহ পর্যন্ত পুনর্গঠন করতে সক্ষম।” (সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:৪)

এই আয়াতটি যখন নাজিল হয় তখন কেউ কল্পনাও করেনি যে আঙুলের ডগা বা ছাপের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিত্বের একক পরিচয়। অথচ আল্লাহ বিশেষভাবে “বনানাহু” (আঙুলের ডগা) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেন পুরো শরীর বলার পরেও আঙুলের কথা আলাদা করে বলা হলো?
এটি বোঝায় যে আল্লাহর জ্ঞান কত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত—তিনি জানেন, এই আঙুলের ডগার রেখাতেই লুকানো আছে মানুষের পরিচয়ের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটি এমন একটি অলৌকিক ইঙ্গিত, যা আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেই পূর্ণভাবে অনুধাবনযোগ্য হয়েছে।

■ চিকিৎসাবিজ্ঞান ■

চিকিৎসা বিজ্ঞান আধুনিক যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞান। রোগ নিরাময়, প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যবিধি—সবই এর আওতায় পড়ে। যদিও আধুনিক মেডিসিন অনেক পরে উন্নত হয়েছে, কোরআন ও হাদিসে বহু আগে থেকেই মানবদেহ, রোগ, খাদ্যাভ্যাস ও চিকিৎসার মৌলিক ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে—যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা

ক) রোগ ও নিরাময়ের ধারণা:

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে রোগ ও তার নিরাময়ের ধারণা অত্যন্ত সরল অথচ গভীরভাবে উপস্থাপন করেছেন। ইব্রাহিম (আ.) বলেছিলেন:

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

"আমি অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।"(সূরা আশ-শুআরা:৮০)

এখানে 'আশ্-শিফা' বা আরোগ্য দানের মালিক হিসেবে একমাত্র আল্লাহকেই চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও মানুষের দায়িত্ব চিকিৎসা গ্রহণ করা।

খ)রোগ প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা:

কুরআনে পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" *সূরা বাকারাহ:২২২)*

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার উপর জোর দেয়, যার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত শারীরিক পরিচর্যা অন্যতম।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে অগ্রগতি ও কুরআনের ব্যাকরণ:

ক) DNA ও জেনেটিক চিকিৎসা:

আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানে DNA বিশ্লেষণ ও জিনগত রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও কুরআনে সরাসরি "DNA" শব্দটি নেই, তবে মানুষের সুনির্দিষ্ট গঠন ও নিয়ন্ত্রিত সত্তার বিষয়ে বলা হয়েছে:

وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে নিদর্শন; তবুও কি তোমরা দেখ না?"(সূরা আয-যারিয়াত:২১)

মানবদেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে আল্লাহর নিদর্শন বর্তমান—এই ধারণা আধুনিক চিকিৎসার গভীর অনুসন্ধানের পথ নির্দেশ করে।

খ) হৃদরোগ, স্নায়ুবিজ্ঞান ও সাইকোথেরাপি:

আধুনিক গবেষণায় হৃদয়কে শুধু রক্তপাম্প নয়, বরং একধরনের অনুভূতিশীল অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, যেটি কুরআনের ভাষার সঙ্গে মিল খায়:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

"নিশ্চয় দৃষ্টিসমূহ অন্ধ হয় না, বরং বক্ষস্থ অন্তর অন্ধ হয়ে যায়।"(আল-হাজ্জ:৪৬)

এই আয়াতের "قلب" বা হৃদয়ের অন্ধত্ব মানসিক বিকার বা সাইকো-সামাজিক রোগের ইঙ্গিত দেয়, যা আজ সাইকোলজি ও নিউরোসায়েন্সের বড় অংশ।

মধু: মধু হলো এমন একটি প্রাকৃতিক উপাদান, যাকে কুরআন রোগের জন্য 'শিফা' বা আরোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও মধুর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং হিলিং ক্ষমতা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছে। এটি শুধু খাদ্য নয়, বরং বহু প্রাকৃতিক ওষুধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

"*তাদের উদর থেকে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় (মধু) বের হয়; এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য।"(সূরা আন-নাহল:৬৯)*

এখানে 'শিফা' শব্দটি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে, মধু শুধু খাদ্য নয়, বরং মানবজাতির জন্য এক ধরনের চিকিৎসা উপাদান।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মধুর ব্যবহার:

(ক) অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ:

মধুতে প্রাকৃতিকভাবে Hydrogen Peroxide উৎপন্ন হয়, যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সক্ষম। বিশেষ করে *Manuka honey* বিভিন্ন সংক্রমণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

(খ) ক্ষত সারানোর ক্ষমতা:

মধু ত্বকে ক্ষত স্থানে লাগালে তা দ্রুত সারতে সাহায্য করে এবং সংক্রমণ রোধ করে। এটি ওয়াউন্ড হিলিং জেল ও ক্রিম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(গ) সর্দি-কাশি ও গলা ব্যথায়:

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, রাতে মধু সেবনে শিশুদের কাশি হ্রাস পায় এবং ঘুম ভালো হয়।

খাদ্য ও স্বাস্থ্যবিধি: আধুনিক খাদ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি মানবজীবনের মৌলিক উপাদান। মানুষ যা গ্রহণ করে এবং যেভাবে জীবনযাপন করে, তা সরাসরি তার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর প্রভাব ফেলে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেমন পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর জোর দেয়, কুরআনেও রয়েছে এই বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশনা।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ:

সুষম খাদ্য:

একজন সুস্থ মানুষের জন্য প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। কুরআনে বিভিন্ন ফলমূল, শস্য ও পানীয়ের উল্লেখ রয়েছে।যেমন: আঙুর, খেজুর, শাকসবজি, জয়তুন বা অলিভ।

হালাল ও পবিত্র খাদ্য:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا

“হে মানুষ! তোমরা যমীনের মধ্যে যা কিছু হালাল ও পবিত্র রয়েছে তা খাও।”(সূরা আল-বাকারা:১৬৮)

এখানে “হালাল (বৈধ)” ও “তইয়্যিব (পবিত্র ও উপকারী)” শব্দ দুটির মাধ্যমে খাদ্যগ্রহণের জন্য নৈতিক ও স্বাস্থ্যগত উভয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

অপবিত্র ও ক্ষতিকর বস্তু নিষিদ্ধ:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ

“আর তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেন সব অপবিত্র বস্তু।”(সূরা আল-আ‘রাফ:১৫৭)

আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও জানায়, ক্ষতিকর খাদ্য যেমন অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত, প্রক্রিয়াজাত, নোংরা বা দূষিত খাদ্য দেহের জন্য ক্ষতিকর।

রোগ প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা: শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, যেমন নিয়মিত হাত ধোয়া, পবিত্র কাপড় পরিধান, গোসল করা ইত্যাদি—কুরআনে ও ইসলামি বিধানে সব সময় গুরুত্ব পেয়েছে। এগুলো আজকের স্যানিটেশন ও পাবলিক হেলথ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মদ ও নেশা:“হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর—এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ; এগুলো থেকে দূরে থাকো যাতে তোমরা সফল হতে পারো।” [সূরা মায়িদা ৫:৯০]

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে, মদ্যপান উচ্চ রক্তচাপ, লিভার সিরোসিস, ক্যান্সার, মানসিক রোগসহ বহু সমস্যার উৎস।

মাতৃদুগ্ধ:মাতৃদুগ্ধ শুধুই দুধ নয়, এই দুধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম ওষুধ। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে মাতৃদুগ্ধ যেসব সন্তান নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পান করার সুযোগ পেয়েছে, তারা রোগে খুব কমই আক্রান্ত হয় এবং এরা মেধাবী হয়। শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, মায়ের দুধও ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে প্রথমে মায়ের বুকে যে দুধ থাকে, অজ্ঞতার কারণে তা অনেকে ফেলে দেয়। অথচ ঐ দুধই হলো সন্তানের সমস্ত রোগের প্রতিষেধক। শিশু বড় হচ্ছে মায়ের দুধও ঘন হচ্ছে, এর কারণ হলো-প্রথমে দুধ ঘন হলে শিশু তা চুষে বের করতে পারবে না এবং সে ঘন দুধ তার অপরিপক্ক পাকস্থলীতে হজম হবে না। পাকস্থলী

ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে থাকে, সেই সাথে মায়ের দুধও ঘন হতে থাকে। এভাবে শিশু যখন বাইরের খাদ্য আহার করতে সক্ষম হয়, তখন মায়ের দুধ ক্রমশঃ ঘন হতে হতে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। মায়ের স্তনে একটি ছিদ্র নেই, একটি ছিদ্র থাকলে তা দিয়ে বেগে দুধ নির্গত হয়ে সন্তানের কণ্ঠনালীতে অসুবিধার সৃষ্টি করতো। এ জন্য মায়ের স্তনে আল্লাহ তা'য়ালা বত্রিশটি ছিদ্র দিয়েছেন যেন সমতা রক্ষা করে দুধ নির্গত হয় এবং শিশু তা পরম প্রশান্তিতে পান করতে সক্ষম হয়।

শিশু যখন বাইরের খাদ্য গ্রহণ করার উপযুক্ত হলো, তখন শক্ত খাদ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার জন্য মাড়িতে দাঁতের প্রয়োজন। এই দাঁতের জন্য আল্লাহর কাছে কারো আবেদন করতে হয়নি। তিনি এমন রব্ব যে, তা না চাইতেই তিনি দিয়েছেন। মানুষের মাথার মগজ-যাকে ব্রেন বলা হয়ে থাকে। এই মগজ এমনভাবে মাথার খুলির ভেতরে রাখা হয়েছে, যেন তা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মগজের চারদিকে বেশ কয়েকটি আবরণ বা পর্দা নির্মাণ করা হয়েছে, এগুলো কোন কঠিন পদার্থ দিয়ে বানানো হয়নি। এগুলো করা হয়েছে নরম এবং সিক্ত। ক্রীম যেভাবে পানির ভেতরে ভাসতে থাকে, মাথার মগজকে সেভাবে সিক্তাবস্থায় রাখা হয়েছে, যেন তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে। মানুষের মাথায় অসংখ্য সেল নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো কম্পিউটার। এই কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা দেখলে হতবাক হতে হয়। তারপরেও কম্পিউটারের মেমোরির একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু মানুষের এই মাথা অনেকগুণ বেশী বিস্ময়কর। মানুষের মাথায় আল্লাহ যে মেমোরি দিয়েছেন, পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য এই মেমোরিতে রাখার পরও আরো বিশাল জায়গা অবশিষ্ট রয়ে যাবে।
দৃষ্টিশক্তি ও শুভ্রতা:চোখের লেন্সে যখন ঘনত্ব বাড়ে বা পচন ধরে, তখন তা ধীরে ধীরে সাদা বা শুভ্র হয়ে যায়—যাকে বলে”ছানিপড়া”। চোখের ক্ষতি হয়ে থাকে দুঃশ্চিন্তার কারণে।

"তিনি (ইয়াকুব আঃ) তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন হায় আফসোস! ইউছুফের জন্য এবং দুঃখে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট।" (সূরা ইউছুফ ৮৪)

দৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়ার মাধ্যমে শুভ্র হয়ে যায়।আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও বলে, চরম মানসিক চাপ চোখের উপর প্রভাব ফেলে—Dry eye, Retinal stress ইত্যাদি।

চর্মরোগ:চর্ম বা ত্বক মানুষের শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ। এটি দেহকে বাহ্যিক আঘাত, জীবাণু, অ্যালার্জি ও তাপমাত্রার ওঠানামা থেকে রক্ষা করে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, বিভিন্ন সংক্রমণ, অটোইমিউন রোগ, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি চর্মরোগের মূল কারণ।

কুরআনে সরাসরি চর্মরোগের নাম উল্লেখ না থাকলেও রোগব্যাধি, ধৈর্য, আরোগ্য এবং দোয়ার মাধ্যমে নিরাময়ের ধারণা দেওয়া হয়েছে—বিশেষ করে আয়িউব (আ.)-এর ঘটনা।
"স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইউবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলল, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌছিয়েছে। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। তাতে গোসল করার জন্য শীতল ও পান করার জন্য ঝরনা নিগর্ত হল।" (সূরা সোয়াদ ৪১-৪২)
আয়িউব (আ.) এমন এক রোগে ভুগছিলেন, যা হয়তো বাইরের ত্বকে দৃশ্যমান ছিল এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল। মুফাসসিরগণ বলেন, তাঁর শরীরের চর্মের ওপর ঘা হয়েছিল, যা এক ধরনের সংক্রামক চর্মরোগের ইঙ্গিত দেয়।

চিকিৎসা ও আরোগ্য:

তাপ, ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক, জীবাণুনাশক এবং হাইড্রোথেরাপি (পানির মাধ্যমে চিকিৎসা) চর্মরোগের কার্যকর পদ্ধতি—যার সঙ্গে আয়িউব (আ.)-এর "ঠাণ্ডা পানিতে গোসল ও পান করার" নির্দেশ মিল রেখে চলে।

■ মন ও স্নায়ুবিজ্ঞান ■

স্নায়ুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এমন দুটি আধুনিক শাখা, যেখানে মানব চিন্তা, আবেগ, স্মৃতি, উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তগ্রহণের জৈবিক ও মানসিক দিক নিয়ে গবেষণা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে, কুরআনে মানুষের মন, হৃদয় ও চিন্তার কেন্দ্র হিসেবে মস্তিষ্ক ও হৃদয় সম্পর্কে এমন সব কথা বলা হয়েছে, যা আধুনিক গবেষণার সঙ্গে গভীরভাবে মিলে যায়।

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

"*তিনি তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তরও দিয়েছেন। (এ সবের জন্য) তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"(সূরা সাজদা:৯)*

এই আয়াতে শ্রবণ, দৃষ্টি ও হৃদয়ের উল্লেখ রয়েছে—যা মানবজীবনের প্রধান জ্ঞানগ্রহণের উপায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে মানুষের চেতনা, স্মৃতি ও বিচারবোধ গঠনে শ্রবণ, দৃষ্টি ও অনুভূতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
হৃদয় শুধু আবেগ নয়, বোধ ও উপলব্ধির স্থান।

“তারা কি দেশ ভ্রমণ করে না, যেন তারা চিন্তাশক্তিসম্পন্ন হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারে এবং কান দিয়ে শোনে? কারণ, চোখ অন্ধ হয় না, বরং বুকে থাকা হৃদয়ই অন্ধ হয়।”(সূরা হজ্ব:৪৬)

আধুনিক নিউরোসায়েন্স দেখিয়েছে, হৃদয়ের সাথে নিউরোনাল নেটওয়ার্ক যুক্ত রয়েছে, যা মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়। কুরআনের ভাষায়, হৃদয় "অন্ধ হয়" অর্থাৎ নৈতিক উপলব্ধির ঘাটতি হয়।

“*না! আমি তাকে কপালের সামনের অংশ দিয়ে পাকড়াও করব — মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠ কপাল।”(*সূরা আলাক:১৫-১৬)

মস্তিষ্কের frontal lobe (কপালের সামনের অংশ) নিয়ন্ত্রণ করে
বিচারবোধ,সঠিক-ভুলের অনুভব,সিদ্ধান্ত গ্রহণ,সামাজিক আচরণ।
এ আয়াত মস্তিষ্কের ঠিক সে অংশের কথাই বলছে, যেটি আজকের নিউরোসায়েন্সে “Decision Making Center” হিসেবে বিবেচিত।

اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

“জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়ে থাকে।”(সূরা রা’দ:২৮)

আধুনিক থেরাপি (যেমন mindfulness, CBT) প্রমাণ করে মানসিক প্রশান্তির জন্য সতর্ক চেতনা ও ইতিবাচক মনোভাব দরকার। কুরআনের নির্দেশ “আল্লাহর স্মরণ” মানসিক চাপ কমিয়ে সেরোটোনিন-এর মতো হরমোন বৃদ্ধিতে সহায়ক।

কুরআনের আলোকে মন ও স্নায়ুবিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতগুলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির এক চমৎকার মিলনস্থল।
যেখানে মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয়, আবেগ, চিন্তা ও অনুভূতির কথা বলা হয়েছে—তা কেবল ধর্মীয় নির্দেশ নয়, বরং আজকের স্নায়ুবিজ্ঞানের একদম কেন্দ্রে অবস্থান করে।

■ পুনর্জন্ম ■

পুনরুত্থান বা মৃতের পুনর্জাগরণ এমন একটি বিশ্বাস যা কেবল ধর্মীয় দর্শন নয়, বরং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনায়ও স্থান পাচ্ছে।
কুরআনে এই বিষয়ে অসংখ্য আয়াত রয়েছে—যা শুধু আখিরাতের জন্য নয়, বরং মানবদেহের গঠন, ধ্বংস ও পুনরায় সৃষ্টি সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেয়।

মৃতদেহ পুনরায় সৃষ্টি হবে:

“সে বলে, কে হাড়গুলোকে জীবিত করবে যখন সেগুলো পচে গেছে?”

বলুন, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তা পুনরায় জীবিত করবেন। তিনিই সব সৃষ্টির জ্ঞান রাখেন।”(সূরা ইয়াসিন ৭৮–৭৯)

এখানে হাড়গোড় পচে যাওয়ার পরও আল্লাহর ক্ষমতায় পুনরায় সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আধুনিক জীববিজ্ঞানে দেখা যায়, ডিএনএ (DNA) মৃতদেহের কিছু অংশে দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকে—যা জীব পুনর্গঠনের সম্ভাবনা দেখায়।

মৃত মাটি থেকেও জীবন সম্ভব:

“তুমি মৃত ভূমির দিকে তাকাও, আমি যখন তার ওপর পানি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব হয়ে ওঠে ও ফুলে ওঠে এবং তা হতে সবধরনের সুন্দর উদ্ভিদ জন্ম নেয়।”(সূরা হজ:৫)

যেভাবে শুষ্ক মৃত মাটি পানির স্পর্শে জীবন্ত হয়, সেভাবেই মানুষের শরীর মাটিতে মিশে গেলেও পুনর্জীবন সম্ভব—এই তুলনাটি প্রাকৃতিক পুনরুৎপত্তির বাস্তব উদাহরণ।

মানুষকে আবার পুনঃনির্মাণ করা হবে:

“আমরা জানি যখন মৃতরা মাটিতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; আমাদের কাছে আছে এক সংরক্ষিত কিতাব।”(সূরা ক্বাফ:৪)

আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক্স বলে- যদি কারো জেনেটিক তথ্য সংরক্ষিত থাকে, তবে ভবিষ্যতে ক্লোনিং বা পুনর্গঠন করা সম্ভব হতে পারে।

কুরআনের এই আয়াত সেই “সংরক্ষিত রেকর্ড” ধারণার প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

পুনর্জন্ম আল্লাহর জন্য সহজ:

“তোমাদের পুনরুত্থান একমাত্র একটি চিৎকারমাত্র; তখনই তোমরা উঠে দাঁড়াবে।”(সূরা সাজদা:৫২)

আধুনিক জিনবিজ্ঞান দেখিয়েছে মানুষের পূর্ণ তথ্য একটি ক্ষুদ্র কোষেই থাকে। তাই একক চিৎকার বা আদেশে পুনরায় জীবন দেওয়া—তাত্ত্বিকভাবে অসম্ভব নয়। কুরআনের ভাষায় এটি সহজ আল্লাহর জন্য।

দেহ, ত্বক, অঙ্গ পুনরায় কথা বলবে:

*“আজ আমি তাদের মুখে সিল লাগিয়ে দেব, এবং তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে, ও তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তারা কী করত।”(*সূরা ইয়াসিন:৬৫)

আধুনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট, রেটিনা স্ক্যান, এবং ডিএনএ ফরেনসিক আজ প্রমাণ করেছে—দেহের প্রতিটি অঙ্গের তথ্য স্বতন্ত্র ও স্থায়ী। এই আয়াত ভবিষ্যতের স্মৃতি-বাহক অঙ্গের সাক্ষ্য সম্পর্কে ইঙ্গিতবাহী।

আধুনিক বিজ্ঞান এখনও মানুষের পুনরুত্থান সম্ভব কিনা—তা নিশ্চিতভাবে বলতে না পারলেও, জিনতত্ত্ব, ক্লোনিং, রিজেনারেশন এবং তথ্য সংরক্ষণের মতো আবিষ্কারগুলো কুরআনের বক্তব্যকে নতুন আলোয় উপস্থাপন করে।

■ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ■

পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। গাছপালা, পশু-পাখি, পাহাড়-নদী ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এক অপূর্ব ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবন টিকে আছে। বিস্ময়করভাবে, পবিত্র কুরআনে এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষার উপর বিস্তর ইঙ্গিত রয়েছে, যা আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান ও সংরক্ষণনীতির সঙ্গে মিল রেখে চলে।

আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান ও জীববৈচিত্র:

আধুনিক বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে যে পৃথিবীর প্রতিটি জীব একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। উদ্ভিদ, প্রাণী, মাটি, পানি, বাতাস সবকিছু মিলেই একটি জৈবিক ব্যবস্থা তৈরি করে। যদি এই ব্যবস্থার কোনো একটি উপাদান ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পুরো ব্যবস্থাটিই ভেঙে পড়ে।

জীববৈচিত্রের অভাবের কারণে ঘটে_খাদ্যশৃঙ্খলে বিশৃঙ্খলা, পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণায়ন বৃদ্ধি, রোগবালাই ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি।

বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদদের মতে, জীববৈচিত্র ধ্বংসের প্রধান কারণ হলো মানুষের অতি ব্যবহার, বন নিধন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূষণ। এসব কারণে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়।

গাছপালা ও সবুজ পরিবেশ:

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার দ্বারা সব কিছুর উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন... অতঃপর তা সবুজ করে দিয়েছেন।"(সূরা আন'আম:৯৯)

এই আয়াতে গাছপালার বৃদ্ধি ও সবুজায়নের পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া বলা হয়েছে, যা আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞানের (Botany) সঙ্গে মিল খায়।

"আর আমি উত্থিত করেছি তাতে (পৃথিবীতে) জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু।"(সূরা ক্বাফ:১১)

গাছপালা শুধু খাদ্য নয়, বরং অক্সিজেন, বায়ু পরিশোধন, ছায়া, ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশগত সচেতনতা সৃষ্টিতে অনন্য।

পানি: জীবনের উৎস

"আমি তো পানি দিয়ে সব জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেছি।"(সূরা আম্বিয়া:৩০)

পানিই পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি ছাড়াই জীববৈচিত্র্য টিকে থাকতে পারে না। এই আয়াত সরাসরি পরিবেশগত জীবনের ভিত্তি পানি সম্পর্কিত।

পশুপাখির বিচিত্রতা ও উপকারিতা:

"আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ প্রাণী, যাদের মাধ্যমে তোমরা উপকৃত হও—তারা তোমার বাহন ও খাদ্যের উৎস।"(সূরা নাহল:৫–৮)

পশু-পাখি পরিবেশের এক অঙ্গ। তারা পরিবেশে পরাগায়ন, বর্জ্য পচন, খাদ্যচক্র রক্ষা, প্রাকৃতিক সুষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কুরআন তাদের উপকারিতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

জীববৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য ও সৃষ্টির রহস্য:

তিনিই পৃথিবীতে সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"(সূরা বাকারা:২৯)

প্রতিটি জীব, বৃক্ষ, বাতাস, পানি সব কিছুর পেছনে একটি উদ্দেশ্য আছে। মানুষ যেন তা নষ্ট না করে বরং রক্ষা করে—এই দায়িত্বও কুরআন ঘুরেফিরে আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

পরিবেশ ধ্বংসের সতর্কতা:

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যাতে আল্লাহ তাদেরকে কিছু ভোগান্তি আস্বাদন করান..."(সূরা রূম:৪১)

এটি একটি আশ্চর্য সতর্কবার্তা। আধুনিক সময়ে মানুষ তার লোভে বন কেটে ফেলে, জলাশয় দুষণ করে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে। ফলে দেখা দেয় পরিবেশ বিপর্যয়, খরা, বন্যা ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং। কুরআন অনেক আগেই এ ব্যাপারে সাবধান করেছে।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু ধর্মীয় নয়—একটি বাস্তব, বিজ্ঞানভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা। এতে মানুষকে প্রকৃতির বন্ধু হতে শেখানো হয়েছে।

আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান যে সব নীতি গ্রহণ করেছে—কুরআন তা বহু আগেই বলে দিয়েছে।

■ সাধারণবিজ্ঞান ■

আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জানার ও ব্যাখ্যা করার একটি পদ্ধতি। কুরআন মানুষের বিবেক, চিন্তাশক্তি ও পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে বারবার বলেছে, "তোমরা কি ভাবো না?" "তোমরা কি দেখো না?" এই প্রশ্নগুলো মূলত একটি বৈজ্ঞানিক মানস গঠনের আহ্বান। তাই ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী নয় বরং একে অপরের পরিপূরক।

চিন্তা ও গবেষণার আহ্বান

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا □□□□□□□□□□□□

"বল, যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান?"
(সূরা আয-যুমার:৯)

এই আয়াত মানুষের মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণের গুরুত্ব তুলে ধরে। বিজ্ঞানচর্চা জ্ঞানের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

সৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ

"নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" *(সূরা আলে ইমরান:১৯০)*

আকাশ, পৃথিবী, দিন ও রাতের পরিবর্তন—সবই এমন প্রাকৃতিক ঘটনা যেগুলোর ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দেয়। কুরআন এসবের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে বলেছে, যা একান্তভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নির্দেশ।

প্রাণ সৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"আমি পানি দ্বারা সব জীবিত জিনিস সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৩০)

এই আয়াতে জীবনের ভিত্তি হিসেবে পানির কথা বলা হয়েছে, যা জীববিজ্ঞানের মৌলিক সত্যের সঙ্গে মিলে যায়। আধুনিক জীববিজ্ঞান বলে যে কোষের ভেতর পানিই জীবনের মূল উপাদান।

ত্বকের সংবেদনশীলতা:

ত্বকের সংবেদনশীলতা বলতে বোঝায় ত্বকের সেই ক্ষমতা যার মাধ্যমে এটি বাহ্যিক উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়া জানায়।যেমন: স্পর্শ, তাপমাত্রা, চাপ, ব্যথা ইত্যাদি।

ধারণা করা হত যে, অনুভূতি ও ব্যথার উপলব্ধি শুধুমাত্র মস্তিস্কের উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, ত্বকে ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে, যা ছাড়া কোন ব্যক্তি ব্যথা উপলব্ধি করতে পারে না।

আগুনের পোড়ার ফলে ক্ষতে আক্রান্ত কোন রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তার একটি সরু পিনের সাহায্যে পোড়ার মাত্রা পরীক্ষা করেন। রোগী ব্যথা অনুভব করলে ডাক্তার খুশি হন, কেননা এতে বোঝে নেন যে অগ্নিক্ষতটি অগভীর এবং ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ অক্ষত রয়েছে। কিন্তু রোগী ব্যথা অনুভব না করলে, বুঝে নেন যে, অগ্নিক্ষতটি গভীর এবং ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ নষ্ট হয়ে গেছে।

"*যারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করব, যখন তাদের গায়ের চামড়া দগ্ধ হবে, আমি সেই চামড়াকে নতুন চামড়া দ্বারা বদলে দেব যেন তারা (শাস্তির পর) শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়।(আন-নিসা: ৫৬)*

এই আয়াতে চামড়ার (ত্বকের) অনুভূতির প্রতি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। চামড়া না থাকলে বা পুড়ে গেলে ব্যথার অনুভব হয় না—এটি আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ত্বকেই

প্রধানত ব্যথা অনুভবকারী রিসেপ্টরগুলো থাকে। কুরআনের এই বিবরণ প্রমাণ করে যে, ব্যথা অনুভব করতে হলে নতুন চামড়ার প্রয়োজন—যা ত্বকের সংবেদনশীলতার বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে মিলে যায়।

দুগ্ধ তৈরির প্রকিয়া :দুগ্ধ তৈরির প্রক্রিয়া একটি জটিল ও বিস্ময়কর জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যা স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহে ঘটে থাকে। কুরআনেও এই প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মিল রেখে বিস্ময় সৃষ্টি করে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুগ্ধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া:

খাদ্য গ্রহণ ও হজম:

গরু বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করে। এই খাদ্য হজমপ্রক্রিয়ায় রক্তে রূপান্তরিত হয় এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে যায়।

রক্ত ও অন্ত্রের ভূমিকা:

খাদ্য থেকে শোষিত উপাদানগুলো রক্তের মাধ্যমে স্তন্যগ্রন্থিতে পৌঁছে। এই স্তন্যগ্রন্থিতে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রক্তের উপাদান থেকে দুধ তৈরি হয়।

স্তন্যগ্রন্থির কার্যক্রম:স্তন্যগ্রন্থিতে উপস্থিত বিশেষ কোষ রক্ত থেকে পানি, ল্যাকটোজ, চর্বি, প্রোটিন ও খনিজ উপাদান গ্রহণ করে এবং দুধ তৈরি করে। পরে তা দুধের নালিতে জমা হয়।

وَاِنَّ لَكُمۡ فِي الۡاَنۡعَامِ لَعِبۡرَةً ؕ نُسۡقِيۡكُمۡ مِّمَّا فِيۡ بُطُوۡنِهٖ مِنۡۢ بَيۡنِ فَرۡثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيۡنَ

“তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে অবশ্যই একটি শিক্ষা রয়েছে। আমি তোমাদের পান করাই তাদের উদরের মধ্য থেকে মল ও রক্তের মাঝখান থেকে একটি বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।”

(সূরা আন-নাহল:৬৬)

)مِنۡۢ بَيۡنِ فَرۡثٍ وَّدَمٍ

মল ও রক্তের মাঝখান থেকে)-এটি আধুনিক জীববিজ্ঞানের সাথে মিলে যায়, যেখানে দুধ উৎপাদিত হয় রক্তের মাধ্যমে খাদ্য উপাদান সরবরাহের মাধ্যমে, যদিও রক্ত ও হজমকৃত পদার্থ সরাসরি দুধে মিশে যায় না।

)لَّبَنًا خَالِصًا

বিশুদ্ধ দুধ)- দুধে কোন মল বা রক্ত মিশ্রিত হয় না, এটি একেবারে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ।

(سَآئِغًا لِّلشَّٰرِبِينَ

যা পানকারীদের জন্য সহজপাচ্য ও সুস্বাদু)- এটি দুধের উপকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

জীব বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা করেছেন যে, গাভী যেসকল খাদ্য খায় তার প্রোটিনের চাইতে গাভীর দুধে প্রোটিন বেশি। এই অতিরিক্ত প্রোটিন আসে গাভীর পাকস্থলীতে থাকা একপ্রকার জীবাণু থেকে! প্রোটিন নেই এমন খাদ্যগুলো এই জীবাণুরা ভক্ষণ করে এবং সেগুলোকে প্রোটিনে রূপান্তর করে। এই দুধে মানব শরীরের প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য উপাদান রয়েছে। তাই এই দুধ সন্তানের জন্য যেমন উপকারী তেমনি উপকারী যুবক, বৃদ্ধ সহ সকল মানুষের জন্য।

মানুষের বোধ ও চিন্তাশক্তি:

"তাদের কি হৃদয় নেই যাতে তারা বুঝে? অথবা কান নেই যাতে তারা শোনে?"(সূরা হজ্জ:৪৬)

অবশ্যই চিন্তাশক্তি মস্তিষ্কের, তবে কোরআনে হৃদয়কেও বোধগম্যতার উৎস বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে হৃদপিণ্ডও স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে অনুভূতি প্রভাবিত করে।

■ উপসংহার ■

কোরআন শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ নয়; বরং এটি মানবজাতির জন্য একটি সর্বজনীন দিকনির্দেশনা, যেখানে বিজ্ঞান, দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সংমিশ্রণ বিদ্যমান। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বহু তথ্য কোরআনে পূর্বেই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা কোরআনের ঐশী উৎসের প্রমাণ দেয়। তবে কোরআন কোনো বিজ্ঞান বই নয়, বরং তা মানব জীবনের সকল দিকের পথপ্রদর্শক। বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল হলেও কোরআনের বক্তব্য চিরন্তন। তাই বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআন অধ্যয়ন আমাদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয় এবং ঈমানকে আরও মজবুত করে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও কোরআনের মাঝে একটি বিস্ময়কর মিল লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন আবিষ্কার যেন কোরআনের কোন না কোন আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি, জ্যোতির্বিদ্যা, ভ্রূণের বিকাশ, পানি চক্র, পর্বতের ভূমিকা—এসব বিষয়ে কোরআনে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলে যায়।

এ থেকে বোঝা যায়, কোরআন শুধুমাত্র ধর্মীয় উপদেশের গ্রন্থ নয়, বরং এটি এমন এক ঐশী জ্ঞানভাণ্ডার, যা মানুষের চিন্তা ও গবেষণার দিকনির্দেশনা দেয়। বিজ্ঞান ও কোরআন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং একে অপরের সহায়ক। এই থিসিসের মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি—আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় কোরআনের বার্তাগুলো আরও স্পষ্ট ও যুক্তিসংগতভাবে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়।

সহায়িকা:

- *আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান ~ ডা.জাকির নায়েক*
- *রহস্যময় কোরআন ~ ডাঃ সৈয়দ শামসুল আরেফিন (সানি)*
- *গুগল, ইউটিউব, chatgpt*

=◑=